সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ (রহ.) রচিত

তাফসীরে ফি যিলালিল কুরআনের আলোকে

সংযোজিত

আল-কুরআনের দাবী

আল-কুরআনের ছায়াতলে

মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল

সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ (রহ.) রচিত

তাফসীরে ফি যিলালিল কুরআনের আলোকে

আল-কুরআনের ছায়াতলে

সংযোজিত

আল-কুরআনের দাবি

মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল

আল-কুরআনের ছয়াতলে

প্রথম প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর ২০০৮

প্রকাশক ঃ
মানজুর মিছবাহ
মিছবাহুল ফালাহ প্রকাশনী
৮০৫/এ, সিডিএ এভিনিউ
মদীনা টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা)
জি ই সি মোড়, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১১৯৫-০০১০৫৫, ০১৮১৬-৪৪২৫০০
E-mail : manjur_mesbah@yahoo.com

বিশেষ সহযোগিতা ঃ
আবদুল্লাহ আল-মামুন

অক্ষর বিন্যাস ও প্রচ্ছদ ঃ
মুহাম্মদ করিমুল ইসলাম

মুদ্রণ ঃ
দারুলফনুন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩১-২৮৬০৩৪৬

বিনিময় ঃ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

....

Al-Quraner Chaya Tole by Muhammad Mostafa Kamil
Published by Mesbahul Falah, 805/A, C.D.A. Avenue, Modina Tower (5th Floor)
Near G.E.C. Circle, Chittagong, Bangladesh.
Phone : 031-2851116, **Price : 50 (Fifty) Taka, US : $ 2**

উৎসর্গ

১। আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা মরহুম হাজী আব্দুল হাকিম মাস্টার। তিনি আজ পৃথিবীতে নেই, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

২। আমার আদর্শ আম্মা যাঁর গর্ভে আমার জন্ম, যাঁর স্নেহ- আদরে আমি বড় হয়েছি। মহান স্রষ্টার কাছে তাঁর দীর্ঘ হায়াতে তাইয়্যেবা কামনা করছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- **আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী (দা. বা.)**
  প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামিয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম।

- **প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক (দা. বা.)**
  প্রো-ভিসি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

- **মাওলানা শামসুল ইসলাম (দা. বা.)**
  সম্মানিত ট্রাস্ট সেক্রেটারী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

- **অধ্যাপক আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী (দা. বা.)**
  চেয়ারম্যান, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন

- **মাওলানা আবু তাহের (দা. বা.)**
  সিনিয়র শিক্ষক ও মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র

- ভূমিকা ৬
- সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৮
- আল-কুরআনের ছায়াতলে ১০
- আল-কুরআন ও মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা ৩১
- আল-কুরআনের ফজিলত ৩৫
- আল-কুরআনের সাহিত্যিক মান ৩৯
- মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দাবী ৪২
- আল-কুরআনের বিধান চিরন্তন ৪৪
- আল-কুরআনের মূল চেতনা ৪৮
- আল-কুরআনের পথ ভারসাম্যপূর্ণ ৫১
- আল-কুরআন সহজ-সরল পথের সন্ধান দেয় ৫৪
- আল-কুরআন সার্বজনীন ৫৬
- আল-কুরআনের ঐতিহাসিক দিক ৫৯
- আল-কুরআনের আলোকে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা ৬০
- আল-কুরআনের আলোকে রাজনীতি ৬৬
- আল-কুরআনের আলোকে শিষ্টাচার ও সৌজন্য ৬৮
- আল-কুরআন ও বিজ্ঞান চর্চা ৭০
- আল-কুরআন ও ভূগোল শাস্ত্র ৭৫
- ইসলামী সভ্যতায় পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি ৭৯

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর কালজয়ী প্রতিভা, ইসলামী গবেষক, বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলামী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রবাদপুরুষ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহ.) রচিত প্রতিটি গ্রন্থ ঈমানী চেতনা ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। তাঁর সাহিত্য-ভাণ্ডার ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তুলে, মৃতপ্রায় জাতিকে করে প্রাণবন্ত। তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে সঞ্জীবনী শক্তি এবং আদর্শ ইসলামী সমাজ গঠনে প্রত্যেক মুমিনকে জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে। তাঁর ক্ষুরধার লেখনির প্রতিটি বাক্যে কুরআনের অমর বাণী, কালজয়ী মিশন মানব সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়ার এক প্রচণ্ড তাগিদ রয়েছে। **'ফী যিলালিল কুরআন'** সাইয়্যেদ কুতুব শহীদের সুদীর্ঘ সাধনা, গবেষণার ফসল ও বাস্তব জীবনে ইসলামী আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এক কালজয়ী অমর তাফসীর। তথাকথিত আধুনিক জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত বিশ্ববাসীর হৃদয়তন্ত্রীতে কোরআনের আবেদন পৌঁছে দেয়ার এক অসামান্য অবদান, এক অভূতপূর্ব যুগোপযোগী তাফসীর। 'ফী যিলালিল কুরআন' অতীতের সবক'টি সেরা তাফসীরগ্রন্থের পাশাপাশি নিঃসন্দেহে আরবী সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন।

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ এক কিংবদন্তী ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামী সাহিত্যাঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' মুসলিম জাতির জন্য মূল্যবান সম্পদ। কুরআনুল করীমের মূল চেতনা অনুধাবনে এর অবদান অতুলনীয়।

যেহেতু 'ফী যিলালিল কুরআন' উচ্চাঙ্গের আরবী ভাষায় প্রণীত, সেহেতু বাংলা ভাষাভাষী ২৫ কোটি মানুষ (যারা আরবী পারদর্শী নয়) এ মহামূল্যবান কিতাবের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত। মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়ার পর, যারা ইতোমধ্যে এ সেরা তাফসীরের অনুবাদ পাঠকদের বরাবরে পেশ করেছেন তাদের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'হাত উঠিয়ে মুনাজাত করছি, হে আল্লাহ! তাদেরকে এ অসামান্য খিদমতের বিনিময় দান করুন, তাদের নেক আমলে বরকত দান করুন, আমীন।

তবে ফী যিলালিল কোরআনের মত বিশাল গ্রন্থের ক্রয় ও ধৈর্য সহকারে পাঠ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই তার উপকারকে আরো ব্যাপকতর করার জন্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে শুধুমাত্র 'ফী যিলালিল কোরআনে'র ভূমিকাটি সরল অনুবাদ করে পাঠকের খিদমতে পেশ করলে কোরআনে করীমের মূল চেতনা ও আবেদন অনুধাবন আরো সহজতর হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই আমি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে কুরানিক সায়েন্স বিভাগে 'তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন' পাঠদানকালে এর অসাধারণ ভূমিকা পড়ে যারপরনেই প্রভাবিত হই এবং সেদিন থেকে এই অমূল্য ভূমিকাটির মূল আবেদন পাঠকের খিদমতে পেশ করার সংকল্প করি। বিশেষ করে আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছাত্র **মাওলানা মানজুর মিসবাহ** এ ক্ষেত্রে আমাকে উৎসাহিত করে ভূমিকাটি ভাষান্তরের জন্য আমাকে অনুপ্রাণীত করে। ইতোপূর্বে প্রকাশিত অনুবাদে কোন কোন জায়গায় অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় এবং কিছু কিছু বাক্যের অনুবাদ একেবারেই আসেনি।

আজ 'আল-কুরআনের ছায়াতলে' নামক পুস্তিকাটি বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকা ভাই বোনদের খিদমতে পেশ করতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দরবারে কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তারপর কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি তাদেরকে যারা বইটির প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে আমার সম্মানিত শিক্ষক বিশিষ্ট গবেষক মাওলানা ফোরকানুল্লাহ খালীল, জামিয়া দারুল মা'আরিফের সম্মানিত মুহাদ্দিস যিনি মূল্যবান সময় দিয়ে আমার বইটি সম্পাদনা করে ধন্য করেছেন এবং আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছাত্রগণ মুহাম্মদ আবুল কালাম, মীর মুহাম্মদ শু'আইব, হারুন অর-রশীদকে। অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া করছি আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছাত্র আব্দুল্লাহ আল মামুনকে; পুস্তিকাটি প্রকাশনা ও অলংকরনের ধাপে ধাপে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছে সে। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ এই পুস্তিকার কোথাও যদি কখনো কোন ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে, মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাদের ধন্য করলে আমরা সাদরে গ্রহণ করে আগামী মুদ্রণে আপনাদের পরামর্শের আলোকে নিখুঁত ও নির্ভুল করার প্রয়াস পাবো।

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রবাদ পুরুষ সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ (রহ.) ১৯০৬ সালে মিসরের আসইউত জেলার প্রাচীন পল্লী মুশায় এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম হাজী ইব্রাহিম কুতুব, মায়ের নাম ফাতিমা হোসাইন ওসমান।

শৈশবেই পবিত্র কুরআন শরীফ মুখস্থ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। পরে সম্মানিত পিতার সংস্পর্শে কায়রোতে চলে এসে তাজহিযিয়াত দারুল উলুমে ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে লেখাপড়া শেষ করে ১৯৩০ সালে দারুল উলুম কায়রো থেকে কৃতিত্বের সাথে বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। সেখানেই অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর থাকাকালীন সময়ে এক পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তাকে আমেরিকা পাঠানো হয়। ফলে তিনি সচক্ষে আধুনিক পৃথিবীর অধঃপতন দেখতে সক্ষম হন। যা তাকে ১৯৫৪ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমীনে যোগদানের উৎসাহ দেয়। নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে স্বল্প সময়ে মুসলিম ব্রাদারহুড আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর ফি যিলালিল কুরআন-এর মত অমূল্য গ্রন্থ রচনার মধ্যদিয়ে পৃথিবীর মানুষকে কোরআনের সুনিবিড় ছায়াতলে আশ্রয় নিতে আহ্বান করতে থাকেন।

১৯৫৪ সালে সাইয়্যিদ কুতুবকে গ্রেফতার করা হয় এবং জেলবন্দী করে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। '৫৫ সালের মে মাসে তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একই বছরের ১৩ জুলাই তারিখে যখন তাকে ১৫ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তখন তিনি এত বেশি অসুস্থ ছিলেন যে, আদেশটি শোনার জন্য আদালতে পৌঁছাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। একটু সুস্থ হলে ফি যিলালিল কোরআনের ১৭ ও ১৮তম খণ্ড প্রকাশ করেন। কারাগার থেকে বের হয়ে বাকি অংশগুলো বের করেন। ১৯৫৬ সালে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে তাঁকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়েন। পরে সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করার শর্তে দণ্ডাদেশ লঘু করার প্রস্তাব দেওয়ার কথা

শহীদ কুতুব শুনেই বলেন, আল্লাহর শপথ! যদি ক্ষমা আমাকে জালিম সরকারের ফাঁসির মঞ্চ থেকেও রক্ষা করতে পারে, তবুও আমি তাগুতের কাছে ক্ষমা চাইব না। যে অঙ্গুলি দিয়ে আমি পবিত্র তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়ে থাকি, সে অঙ্গুলি দিয়ে জালিমের কাছে ক্ষমা চাইতে পারি না। দীর্ঘ ১০ বছরের শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন ও নিপীড়নের পর ১৯৬৪ সালের তদানীন্তন ইরাকী প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফের ব্যক্তিগত অনুরোধের ভিত্তিতে কিছুদিনের জন্য তাকে মুক্তি দিলেও তাকে আবার গ্রেফতারের অজুহাত খুঁজতে থাকে শাসক চক্র।

মধ্যপ্রাচ্যসহ সারাবিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের জন্য সাইয়্যিদ কুতুব ছিলেন তখন প্রেরণার উৎস। এটা নাসের চক্রের সহ্য হলো না। তারা ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে তাকে পুনরায় কারারুদ্ধ করলে তিনি বলেন, আমি জানি জালিমরা এবার আমার মাথাটি চায়। আমার কোন আক্ষেপ নেই, বরং আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করতে পারা আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার।

১৯৬৬ সালের ২৯ শে আগস্ট সুবহে সাদিকের সময় জামাল নাসির সরকার সাইয়্যিদ শহীদ কুতুব এবং তাঁর দু'জন সাথীকে নির্মমভাবে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে দেয়।

সাইয়্যিদ শহীদ কুতুব (রহ.) শাহাদাতের পেয়ালা পান করে চিরতরে জান্নাতুল ফেরদাউসবাসী হয়ে যান।

কুরআনের মত অপরূপ ও পবিত্র চারণ ভূমি সম্মানিত স্থান, দীপ্তিময় প্রদীপ।

কুরআনের সান্নিধ্যে এসে আমি অনুধাবন করছি যে, মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত জীবনাদর্শ ও আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এই মহাবিশ্ব চলনের মধ্যে একটা গভীর সাযুজ্য রয়েছে। আমি আরো বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, মানবতার বিপর্যয়ের মূল কারণ হচ্ছে মানব প্রকৃতি সম্মত জীবনাদর্শ থেকে বিচ্যুতি ও যে সহজাত্য দিয়ে আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার সাথে সাংঘর্ষিক নষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা। কোন বিতাড়িত শয়তান মানব জাতিকে এই জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে? হায় আফসোস!!! কুরআন অধ্যয়নে আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই বিশ্ব জগৎ অসীম এবং অদৃশ্যমান বিশ্ব এই দৃশ্যমান বিশ্বের চেয়ে অনেক বিশাল ও বিস্তৃত। জগৎ দু'টি; একটি দৃশ্যমান ও অপরটি অদৃশ্যমান। একটি ইহজগৎ ও অপরটি পরজগৎ। একমাত্র ইহজগৎ সব কিছু নয়। মানব জীবন কালের শাখা প্রশাখায় বিস্তৃতি হয়ে আছে। মৃত্যু তার পরিসমাপ্তি নয় বরং যাত্রাপথের একটি মনযিল মাত্র। ইহকালে মানুষ যা কিছুই অর্জন করে শুধু সেটুকুই তার প্রাপ্তি নয়। প্রাপ্তির একটি অংশবিশেষ। আরো অনেক কিছু তার জন্যে অপেক্ষা করছে। কেউ দুনিয়ায় স্বীয় ভাল ও মন্দ কর্মের ফল ভোগ করতে না পারলেও পরকালে অবশ্যই তা পাবে। কারণ সেখানে জুলুম নেই। নেই কোন অন্যায়-অবিচার। পৃথিবী নামক এই গ্রহে মানুষ যে সময়টুকু অতিবাহিত করে তা পরিচিত পছন্দনীয় সাময়িক বিচরণ মাত্র। এমন প্রাণীজগৎ যে জগতের প্রাণীরা তাদের স্রষ্টার সামনে সব সময় বিনয়ের সাথে মস্তক অবনত করে।

আল্লাহ্ বলেন,

(وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ)

"নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সবকিছুই তাঁর সামনে মাথানত করছে এবং তাঁরই আশ্রয়তলে সবাই সকাল-সন্ধ্যা অবনত মস্তকে নিমগ্ন আছে।" (আর রা'দ : ১৫)

আল্লাহ আরো বলেন,

(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً)

"সপ্ত আসমান পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করে এবং সৃষ্টি জগতে এমন কোন বস্তু নেই যা তার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহত্ব বর্ণনা করে না।"-(বনী ইসরাঈল-৪৪)

এবাদতের এই সার্বজনীন সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ রূপ মানুষের হৃদয়ে আনন্দ, তৃপ্তি ও আত্মবিশ্বাসের যে প্লাবণ সৃষ্টি করে তার চেয়ে সুখ আর শান্তি কি হতে পারে?

আমি কুরআনের আশ্রয়ে এসে অনুধাবন করতে পেরেছি, যে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এমন সম্মানের আসনে আসীন করেছেন, যা তারা ইতোপূর্বে কখনো লাভ করেনি, ভবিষ্যতেও কখনো পারবে না। কারণ মানুষ আল্লাহর পবিত্র আত্মার ফুৎকারের সৃষ্টি।

ইরশাদ হচ্ছে,

(فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ)

"যখন আমি তাকে (মানব আকৃতিকে) সৃষ্টি করব এবং তাকে আমার রূহ দান করব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদাবনত হয়ে পড়বে।"(সূরা আল-হিজর : ২৯)

এই ফুৎকারের বদৌলতে মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)

"যখন তোমার প্রতিপালক বললেন, আমি জমিনের বুকে আমার এক প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি।" (সূরা আল-বাকারা :৩০)

পৃথিবীর বুকে যা আছে সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা মানুষের অধীনস্থ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেন,

(أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ)

"তুমি কি লক্ষ করনি? যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহ তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছে।" (সূরা হজ্ব : ৬৫)

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানব জাতিকে সম্মান ও মর্যদার সর্বোচ্চ শিখরে আসীন করেছেন? তাই আল্লাহ কেন্দ্রিক বিশ্বাসই মানুষের পরস্পরের

সম্পর্কের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে এবং মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নির্ধারিত হবে। এই বিশ্বাসই হচ্ছে ঈমান ও আক্বীদার বন্ধন। এই বিশ্বাসই মুমিনের জন্য দেশ, জাতি ও পরিবার হিসেবে গণ্য হবে। শুধুমাত্র এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই মানব জাতির জন্য একটি অভিন্ন প্লাটফর্ম সৃষ্টি হতে পারে। মানুষ কোন জীবজন্তু নয় যে, ঘাস, চারণভূমি, পাল ও ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে তাদের এক স্থানে একত্রিত করা যাবে।

ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে মুমিনরা ঐতিহ্যবাহী খান্দানের সদস্য। নিশ্চয়ই তারা প্রত্যেকেই সেই সম্মানিত কাফেলার সদস্য, যে কাফেলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হযরত নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), মূসা (আঃ) ও মুহাম্মদ (সঃ) এর মত সম্মানিত নবীর দল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ)

"নিশ্চয়ই তোমাদের এই দল মূলত তা একই দল এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।" (সূরা মু'মিনুন : ৫২)

আদিকাল থেকে ইতিহাসের সর্বস্তরে বিস্তৃত এই সম্মানিত কাফেলাকে স্থান ও জাতির ভিন্নতা সত্ত্বেও যুগে যুগে একই ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতি, একই ধরনের অভিজ্ঞতা ও একই ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। যা কুরআন অধ্যয়নের সময় আমার স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। তারা পথভ্রষ্টতা, অজ্ঞতা, অবাধ্যতা, প্রবৃত্তির অনুকরণ, জুলুম-অত্যাচার, হুমকি-ধমকি, নির্বাসন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন তারা সাহসিকতা, মনোবল ও আল্লাহর সাহায্যের উপর দৃঢ় আস্থা ও তাঁর অঙ্গীকারের উপর অবিচল বিশ্বাস রেখে সামনে এগিয়ে গেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ . وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ)

"যারা কাফের (আল্লাহ তা'আলার প্রতি অবিশ্বাসী ছিল), তারা তাদের নবীদের বলল, আমরা তোমাদের এই জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের দলে শামিল হবে। অতএব, আল্লাহ তা'আ'লা তাদের কাছে ওহি পাঠিয়ে বললেন, আমি জালেমদের ধ্বংস করে দেব। এই জমিনে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করব। একথা তাদের সামনে প্রযোজ্য যারা পরকালে আমার সামনে উপস্থিত হওয়াকে এবং আমার আযাবকে ভয় করে।" (সূরা ইবরাহীম : ১৩-১৪)

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে প্রতিভাত হচ্ছে এই সম্মানিত কাফেলা যুগে যুগে অভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি, অভিন্ন অভিজ্ঞতা, অভিন্ন হুমকি, অভিন্ন একীন ও বিশ্বাস এবং অভিন্ন অঙ্গীকারের সম্মুখীন হয়েছে। যুগ পরিক্রমায় জুলুম, অত্যচার, হুমকি ধমকি, অবিচার-অনাচারের শিকার হলেও সবশেষে শুভ পরিণাম তাদের পদচুম্বন করেছে।

কুরআনের ছায়াতলে আমি জেনেছি যে, এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি কোন ঘটনাচক্র নয়। হঠাৎ করে আকস্মিকভাবেও সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলা পরিকল্পিতভাবে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)

"আমি প্রতিটি জিনিসকে সঠিক পরিমাপের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আল-ক্বামার : ৪৯)

তিনি আরো বলেন,

(وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا)

"তিনি প্রত্যেক জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন অতএব, সুনির্দিষ্ট পরিমাপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" (সূরা ফুরকান : ২)

আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি কাজই যৌক্তিক ও প্রজ্ঞাময় তবে অদৃশ্যের সুগভীর হিকমত মানবীয় দুর্বল জ্ঞানে বুঝাটা কষ্টসাধ্য হওয়াটা স্বাভাবিক।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

(فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)

"হয়ত তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তা'আলা তাতে অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।" (সূরা নিসা : ১৯)

তিনি আরো বলেন,

(وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)

"এবং হয়তবা তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং কোন কিছু তোমাদের পছন্দ হয়েছে অথচ তোমাদের জন্য তা ক্ষতিকর। আল্লাহই ভাল জানেন অথচ তোমরা জান না।" (সূরা আল-বাক্বারা:২১৬)

উপায়-উপকরণের উপর সব সময় ফলাফল নির্ভর করে না। উপকরণ কখনো কার্যকর হয় আবার কখনো কার্যকর হয় না। কারণ উপায়-উপকরণ ফলাফলের একমাত্র কার্যকরী শক্তি নয়। তবে ভাল মন্দ সব ধরনের ফলাফলের পেছনে একমাত্র কারণ ও কার্যকরী শক্তি হল মহান রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ও আদেশ। উপায় উপকরণ ও ফলাফল উভয়ের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলা।

আল্লাহ বলেন,

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً

"তোমার জানা নেই, হয়তবা আল্লাহ তা'আলা এর কোন সমাধান বের করে দেবেন।" (সূরা তালাক : ১০)

তিনি আরো বলেন,

(وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)

"এবং তোমরা কিছুই আশা করতে পার না, তবে যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হয়।"(আত তাকউইর : ২৯)

মু'মিন বান্দা উপায় উপকরণ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা উপায়-উপকরণ ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন। তবে তার বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এসব কিছুর কাঙ্খিত ফলাফল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে।

মু'মিন আল্লাহর রহমত, ন্যায় বিচার, প্রজ্ঞা ও ইলমের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখে। তিনিই তাঁর একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু ও আশ্রয়স্থল। যাবতীয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।

আল্লাহ বলেন,

(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الفَقْرَ وَيَأمُرُكُمْ بِالفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)

"শয়তান তোমাদের দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং তোমাদের অশ্লীল কাজের আদেশ করে, (পক্ষান্তরে) আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তার ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ তা'আলা বিশাল ও অনেক প্রজ্ঞাময়, প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী।" (সূরা আল-বাক্বারা-২৬৮)

আমি কোরআনের ছায়াতলে অস্থিরতামুক্ত, প্রশান্ত হৃদয়ে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন কাটিয়েছি। আমি প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি বিষয়ে মহান আল্লাহর শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখেছি। আমি আল্লাহর সান্নিধ্যে তার রহমতের ছায়াতলে জীবন ধারণ করেছি। আমি কোরআনের ছায়াতলে জীবন ধারণ করতে গিয়ে আল্লাহর গুণাবলীর কার্যকারিতা গভীরভাবে অনুভব করেছি।

আল্লাহ বলেন,

(أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ)

"যখন সে তাঁর কাছে দোয়ার হাত উঠায়, তখন এমন কে আছেন যিনি অস্থির হৃদয়ের আকুতি শ্রবণ করেন, আবার কে এমন আছে যিনি তার কষ্টসমূহ দূরীভূত করেন?" (সূরা আন-নামল : ৬২)

তিনি আরো বলেন,

(وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ)

"তিনি স্বীয় বান্দাদের উপর বিপুল ক্ষমতাবান এবং প্রজ্ঞাময় ও সম্যক অবগত।" (সূরা আল-আন'আম : ১৮)

তিনি আরো বলেন,

(وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)

"আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কার্যকলাপের উপর অসীম ক্ষমতাবান, যদিও অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (সূরা ইউসুফ : ২১)

তিনি আরো বলেন,

(نَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ)

"জেনে রাখ আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে প্রাচীর হয়ে থাকেন।" (সূরা-আনফাল : ২৪)
তিনি আরো বলেন,

(فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ)

"যা তিনি চান তা তিনি করেন।" (সূরা বুরুজ : ১৬)
তিনি আরও বলেন,

(مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [2] وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে তিনি তার জন্য কোন না কোন পথ বের করে আনেন এবং এমনভাবে তার রিযিকের ব্যবস্থা করেন যার কোন ধারণাও সে করতে পারে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করবে তিনি নিজেই তার জন্য যথেষ্ট, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা সহজেই সম্পন্ন করতে সক্ষম।" (সূরা আত-তালাক্ব : ২৩)
তিনি আরো বলেন,

(مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا)

"বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণী তার নিয়ন্ত্রণাধীন।" (সূরা হুদ : ৫৬)
তিনি আরো বলেন,

(أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ)

" আল্লাহ তা'আলা কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন এবং তারা তাকে ছাড়া তোমাদের লোকদের ভয় দেখায়।" (সূরা জুমা'আ : ৩৬)
তিনি আরো বলেন,

(وَمَنْ يُهِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ)

"আল্লাহ যাকে অসম্মানিত করেন, তাকে সম্মানিত করার কেউ নেই।" (সূরা আল-হজ্ব : ১৮)
তিনি বলেন,

(وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)

"আল্লাহ তা'আলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই।" (সূরা আল-জুমার : ২৩)

আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জগতকে সৃষ্টি করে অন্ধ যান্ত্রিক প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ছেড়ে দেননি, বরং তথায় সার্বক্ষণিকভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের পিছনে আল্লাহর স্বাধীন ইচ্ছাই কার্যকর থাকে। আল্লাহ তা'আলা যেকোন কিছু সৃষ্টি করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

অনুরূপভাবে আমি অনুধাবন করতে পেরেছি যে, আল্লাহর কুদরত নিজস্ব গতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যকর, সেক্ষেত্রে আমাদের তাড়াহুড়া করার কিছুই নেই। আল্লাহর প্রদত্ত জীবন বিধান (কুরআন অধ্যয়নে যা আমার মনে হয়েছে) মানব জাতির প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেকটি ধাপে সমানভাবে উপযোগী। এগুলো পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের কল্যাণেই প্রণীত। প্রণয়ণের ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাবসূলভ শক্তি, সামর্থ এবং তাদের পরিবর্তনশীল অবস্থাকে লক্ষ্য রেখেই প্রণীত। এই জীবন বিধান মানুষকে এবং পৃথিবীতে তার ভূমিকাকে তুচ্ছ করে দেখে না। এবং তার জীবনের কোন স্তরকে অবজ্ঞা করেনা চাই সে ব্যক্তি হিসেবে হোক বা কোন দলের সদস্য হিসেবে হোক। সবক্ষেত্রে তাকে এবং তার অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করে, পক্ষান্তরে তার যোগ্যতা ও সামর্থের বাইরে অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় না। যা তার সহজাত প্রকৃতির পরিপন্থী। উভয় অবস্থা থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এত তুচ্ছ নয়, যা মানব রচিত দর্শন দিয়ে সৃষ্টি করা যাবে এবং কলমের খোচায় পাল্টে দেয়া যাবে। মানুষ তার সহজাত যোগ্যতা, স্বভাবজাত লোভ প্রবণতার বিচারে আল্লাহর মহান সৃষ্টি। যাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তাদের জন্য নিধারিত পূর্ণতা সমৃদ্ধির চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে দিতে পারে। সে তার স্বীয় যোগ্যতা ও স্বভাবকে যথাযথ মূল্যায়ন করে নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে দিতে পারে। হতে পারে একজন সফল মানুষ, আল্লাহর মাকবুল বান্দা ও খলিফা। তবে ইসলামের এই পথ পরিক্রমা সুদীর্ঘ ও সময় সাপেক্ষ। যা মানুষের স্রষ্টা ও কুরআন নাযিলকারী মহান আল্লাহ জানেন। সে জন্য ইসলাম মহান আল্লাহর এই উদ্দেশ্য হাছিলে যৌক্তিক গতিতে এগিয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে তার কোন তাড়না ছিল না। তার সামনে ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত সময়। ইসলামী জীবন বিধানের বাস্তবায়ন কোন ব্যক্তির জীবনের সাথে সীমাবদ্ধ নয় মৃত্যুর পথ যাত্রী, কোন ব্যক্তির মনোবাসনা আগ্রহ, আশা-আকাংখা পুরণেও তাকে অনুপ্রাণিত করে না । সূদূর প্রসারী লক্ষ্য বাস্তবায়নের পূর্বেই

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। যেমন, অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের বেলায় হয়ে থাকে, যারা বিষয়টিকে একটি প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে। তারা ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতিকে এড়িয়ে চলে। কারণ তারা তার উপর অটল থাকতে পারে না। যে অপরিকল্পিত পথ দিয়ে তারা চলে, সে পথে অনেক হত্যাযজ্ঞ হয়, অনেক রক্ত প্রবাহিত হয়, অনেক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যায়, অবশেষে তারাও ধ্বংসের শিকার হয়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাদের মতবাদগুলো। পক্ষান্তরে ইসলাম মানব প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে নম্র-কোমলভাবে এগিয়ে চলে, কখনো তাকে উৎসাহিত করে, কখনো তাকে বারণ করে বাকা পথে চলতে চাইলে সোজা পথে নিয়ে আসে, কিন্তু তাকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে না, চুর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় না। যে এ প্রকৃতির উপর অটল অবিচল থাকে সেই বুদ্ধিমান দুরদর্শী ব্যক্তির মত, যে তার অভীষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত ও আস্থাশীল। সে জানে যে, প্রথম প্রচেষ্টায় লক্ষ্য পূরণ না হলেও দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়, অথবা দশম অথবা শততম অথবা সহস্রতম প্রচেষ্টায় হলেও লক্ষ্যে পৌছতে পারবে।

সময় তো বিস্তৃত, লক্ষ্য সুস্পষ্ট ও পথ পরিক্রমা সুদীর্ঘ। একটি বৃক্ষ যেমন মাটির নীচে শিকড় বিস্তৃত করে ডালপালা ছড়িয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে, একটি বিশাল মহীরূহে পরিণত হয় .. ঠিক তেমনিভাবে ইসলামও ধীরে ধীরে শান্ত, স্থিরভাবে বিস্তৃত হয় ... এরপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যা হওয়ার তা হয়।

এই বাগান কখনো ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে, কখনো কীট পতঙ্গ, খরা বা প্লাবন তাকে আক্রান্ত করে কিন্তু দূরদর্শী কৃষক জানে এ বাগান সব দুর্যোগ মোকাবেলা করে বেড়ে উঠবে তাই সে বিচলিত হয় না, অধীর ও অস্থির হয় না এবং এ স্বাভাবিক ভারসাম্যপূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতয় করে বাগানকে ফলবতী করার চেষ্টা করে না। সমস্ত সৃষ্টি জগতে এটাই ঐশী বিধান।

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٤٣)

“আর তুমি কখনো আল্লাহর নিয়মের বিপরীত দেখতে পাবে না।”
(সূরা ফাতির : ৪৩)

এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে মহান আল্লাহর বিধানই মূল চালিকাশক্তি। এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি কোন ঘটনাচক্র নয়। হঠাৎ করে আকস্মিকভাবে সৃষ্টি

হয়নি। বরং তার সৃষ্টি পরিকল্পিতভাবেই হয়েছে। তার সৃষ্টির পিছনে রয়েছে হক্ব, মহাসত্য স্বয়ং আল্লাহ্। যার অস্তিত্ব থেকেই যাবতীয় সৃষ্টি অস্তিত্ব অর্জন করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٦٢)

"ইহা এজন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তিনিই 'হক'। তাকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকে তারাই বাতিল। (সূরা হাজ্জ : ৬২)

আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টিতে বাতিলের কোন অবকাশ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

(مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা একে হক ছাড়া আর কিছু দিয়েই সৃষ্টি করেননি" (সূরা ইউনুসঃ ৫)

তিনি আরো বলেন,

(رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

"হে আমার প্রভু তুমি এই সৃষ্টি কূলকে নিরথর্ক সৃজন করোনি। তুমি কতই পবিত্র" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৯১)

"হক" এই বিশ্ব জগতের অস্তিত্বের মূল, হক থেকে বিচ্যুত হলে তার ধ্বংস অনিবার্য"

আল্লাহ বলেন ঃ

(وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ)

অর্থাৎ ঃ যদি হক (আল্লাহ) তাদের মনোবাসনার আনুগত্য করেন তাহলে নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও তদুভয়ের মধ্যে যা আছে তা সব ধ্বংশ হয়ে যাবে। (সূরা আল মু'মিনুনঃ ৭১)

তাই সত্যের বিজয় অবধারিত এবং মিথ্যার পতন অনিবার্য বাইরের দৃশ্য যতই প্রতিকূল হউক না কেন শেষ পরিনাম সত্যের জন্যই অবধারিত।

(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ)

অর্থাৎ "আমি বরং সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি। সত্য মিথ্যাকে ধ্বংস করে দেয়। অতঃপর মিথ্যা দুরীভূত হয়। (সূরা আল আমবিয়া-১৮) যা কিছু চির কল্যাণকর, সত্যের ন্যায় দীর্ঘস্থায়ী হয়ে টিকে থাকবে অনন্ত কাল। আল্লাহ বলেন,

(أنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ)

"তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোত ধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমান অনুযায়ী। অতঃপর স্রোত ধারা স্ফীত ফেনা রাশি উপরে নিয়ে আসে এবং অলংকার অথবা তৈজস পত্রের জন্য যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও তেমনি ফেনা রাশি থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ সত্যও মিথ্যার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতঃপর ফেনাতো শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, এবং যা মানুষের কল্যাণকর তা পৃথিবীতে স্থায়ী হয়। আল্লাহ এমনিভাবে দৃষ্টান্ত সমূহ বনর্না করেন।" (সুরা আর রা'দঃ ১৭)
তিনি আরো বলেন,

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ- وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ - يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ)

"তোমরা কি দেখোনি, যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালাম এর কি সুন্দর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তা যেন একটি ভাল বৃক্ষ যার ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত ও তার শাখা প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। নিজ মালিকের আদেশে তা সর্বদা ফলমূল সরবরাহ করে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য উপমা পেশ

করেন। যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন। এবং মন্দ কথার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি মন্দ বৃক্ষের ন্যায় যাকে যমীনের উপরিভাগ থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। তার কোন স্থায়ীত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সঠিক ও পরিশুদ্ধ কথার দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে তাদের অটল রাখেন। "আল্লাহ তা'আলা জালিমদের পথভ্রষ্ট করে দেন এবং তিনি যা চান তাই করেন।" (সুরা ইবরাহীমঃ ২৪-২৭)

ইসলামী জীবন বিধান মানুষের অন্তরে এমনি অনাবিল প্রশান্তি, মানসিক স্থিরতা ও সত্যনিষ্ট আস্থা, তুচ্ছ দুনিয়ার মোহকে জয় করার শক্তি সঞ্চারিত করে যা অন্য কোন জীবনাদর্শে পাওয়া সম্ভব নয়।

আমি কুরআনের ছায়াতলে এ দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, সমগ্র পৃথিবীর শৃংখলা মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আলোকে পুত পবিত্র উন্নত জীবন একমাত্র আল্লাহর বিধানেই সম্ভব। আল্লাহর দিকে আসতে হবে। আল্লাহর দিকে ফিরে আসার একমাত্র পন্থা হচ্ছে ইসলামী জীবনাদর্শকে মানুষ গ্রহণ করবে। জীবনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র কুরআনে হাকিম থেকেই পথ প্রদর্শনা নিবে। সর্বোপরি আল্লাহর কিতাবকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করবে। এ পন্থা ছাড়া আর সব কিছুই পৃথিবীর ধ্বংশ, বিপর্যয় নিয়ে আসবে এবং জীবনকে ঠেলে দেবে ধ্বংসাত্মক জাহিলিয়াতের দিকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)

"অতঃপর যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখো তারা একমাত্র তাদের প্রবৃত্তির দাসত্বই করে যাচ্ছে, তার চেয়ে ভ্রষ্ট ব্যক্তি কে আছে যে, আল্লাহর হেদায়ত কে উপেক্ষা করে স্বীয় মনোবৃত্তির আনুগত্য করে। অবশ্যই আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়াত করেন না।" (সূরা আল কাসাস-৫০)

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানকে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহণ করা ঐচ্ছিক কোন বিষয় নয় বরং এর উপর ঈমানের সমগ্র ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত।

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)

"মু'মিন পুরুষ বা মহিলার এই অধিকার নেই যে, যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) কোন ব্যাপারে ফায়সালা করেন, তখন তাদের গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার থাকে না।" (সূরা আহযাব : ৩৬)

(ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين)

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তোমাদেরকে দ্বীনের এক বিশেষ তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, তোমরা এসবই অনুসরণ করো। অজ্ঞ ও জাহেল ব্যক্তির খেয়াল খুশীর অনুসরণ করোনা। আল্লাহর সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবেনা। যালেমরা একে অপরের বন্ধু । আর আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদের বন্ধু। (সূরা আল জাসিয়া-১৮,১৯)

বিষয় অসামান্য। অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক আকিদার বিষয় গোটা মানব জাতির সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির সকল ধরনের দুঃখ দুদর্শা, বালা-মুসিবতের সুন্দর সামাধান ইসলামী জীবন বিধানের মাঝেই রেখে দিয়েছেন। যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রনার নিরাময় রোগ মুক্তি একমাত্র আল্লাহর বিধানেই নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)

অর্থাৎ ঃ আমি কুরআনে এমন জিনিস নাযিল করিছি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত, (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৩)

তিনি আরো বলেন,

(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)

"নিশ্চয় এই কুরআন সঠিক ও সহজ পথের সন্ধান দেয়।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৯)

তবে মানব জাতির দুর্ভাগ্যের মূল কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহবিমূখ হয়েছে, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বিরাজমান সমস্যার সঠিক সমাধান আবিষ্কারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তারা স্বীয় সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ে, সর্বোপরি মানবতার কল্যাণে এতটুকুও করতে পরেনি, যা তারা সচরাচর তাদের দৈনন্দিন জীবনে করে থাকে।

তাদের স্বভাব হল ব্যবহৃত কোন যন্ত্রপাতি, দ্রব্য-সমাগ্রী যদি বিকল হয়ে যায় অথবা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়, তখন তারা তা ঠিক করার জন্য সংশ্লিষ্ট কারখানার প্রকৌশলীর শরণাপন্ন হয়ে থাকে এবং তাদের সাহায্যেই তার বিকল যন্ত্রটিকে সচল করে থাকে। দুঃজনক হলেও সত্য যে, মানুষ নিজস্ব বিষয়ে এ চিরাচরিত নিয়ম-নীতি মানতে প্রস্তুত নয়। সৌভাগ্যের জন্য নিজের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে মানুষ নামক এ বিস্ময়কর সৃষ্টি মহান স্রষ্টা, বিধানদাতা, মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হয় না। স্বভাবতই স্রষ্টাই সৃষ্টির ব্যাপারে অধিক জানার কথা। তাঁর দেয়া বিধানের মধ্যেই সৃষ্টির কল্যাণ নিহিত আছে। তার প্রেরিত কিতাব আল- কুরআনই দিতে পারে তাদের সকল সমস্যার সমাধান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)

তিনি অন্তর্যামী। যিনি সৃষ্টি করলেন তিনি কি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী"। (সূরা মূলকঃ ১৩-১৪)

এটাই পথহারা মানব জাতির দূর্ভাগ্যের মূল কারণ।

বিভ্রান্ত অসহায় মানবতার সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি একমাত্র মহান স্রষ্টার প্রাকৃতিক বিধানেই রয়েছে। তাকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর দিকে। যেমনি নগণ্য ব্যবহার্য সামগ্রী সচল করার জন্য আমরা তার কর্মকারের কাছে নিয়ে যাই, মানব জাতি তার সুদীর্ঘ ইতিহাসের আঁকেবাঁকে অনেক ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু ইসলাম মানব জাতির নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যার পরিণতিতে মানবতা এমন মারাত্মক বিপর্যয় ও ধ্বংসের সম্মুখীন যার নজির মানব

ইতিহাসে বিরল। মানব সমাজ যখন বিকৃত পচনশীল নেতৃত্বের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বহুমুখী বিপর্যয়ের মুখোমুখী, তখনই ইসলাম এই নষ্ট সমাজকে রক্ষা করার জন্য হাল ধরে এবং সমাজের নেতৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়। আল্লাহ বলেন,

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاس)

"মানুষের কর্মফলের কারণে জলে-স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে।" (সূরা আর রূমঃ ৪১)

আল-কুরআনের আলোকে ইসলাম সমগ্র মানব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করল। কোরআনের আনীত নতুন বিধানে তাদের জীবনকে নব সাজে সজ্জিত করল এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ নতুন জীবন উপহার দিল। বদলে দিল তার চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনের মূল্যবোধ সবদিকে একটি পরিবর্তনের চাপ, সত্যিকারের আমূল পরিবর্তন।

মানব জাতিকে উপহার দিল একটি স্বপ্নের সমাজ, সেখানে ছিল চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য, মহানুভবতা, আত্মমর্যাদাবোধ, সরলতা, প্রাঞ্জলতা, শিষ্টাচার, বাস্তবতা ইত্যাদি বহু গুণের সমাহার। ইসলাম সরে দাঁড়াল নেতৃত্বের মঞ্চ থেকে। অতঃপর তাদের উপর নেমে আসে ধ্বংস ও বিপর্যয়। ইসলাম সরে গেলে তার জায়গা পুনরায় দখল করে নিল নব্য জাহেলিয়াত। নতুন পোশাকে নতুন লেবাসে বস্তুবাদের আকর্ষনীয় চিত্রে। যা দেখে বিশ্ববাসী মুগ্ধ হয়ে গেল। অবুঝ শিশু যেমন ফুলেল রঙ্গিন পোশাক ও রং-বেরংয়ের খেলনা সামগ্রী দেখে পাগল হয়ে পড়ে।

মানবতার শত্রু এবং প্রতারক চক্র মানুষের উপর সওয়ার হয়ে পড়লো। মানব জাতিকে এই বলে ধোঁকা দিল যে, আল্লাহর বিধান এবং বৈষয়িক আবিষ্কার-পরস্পর সাংঘর্ষিক এবং এদের উভয়ের রাস্তা আলাদা। উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটাকে বেছে নিতে হবে। ইলাহী বিধানকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে বিজ্ঞানের তামাম আবিষ্কারের সুফল থেকে বঞ্চিত হতে হবে। আর যদি বিজ্ঞানের অবদান থেকে উপকৃত হতে চাও সনাতন ইসলামী বিধান থেকে বিরত থাকতে হবে। বাস্তবে ইসলামই মানুষের সৃষ্টিশীল সুপ্ত প্রতিভার উৎকর্ষ সাধনে অসামান্য অবদান রেখেছে। মানুষকে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করেছে। বিজ্ঞানকে যুগে যুগে সঠিক পথের দিশা দিয়েছে। যাতে মানুষ তার উপর অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব

পালনে সক্ষম হয়। আল্লাহ তাদের বিরল সম্মানে সম্মানিত করেছেন। খেলাফতের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হওয়ার জন্য বিশ্ব চরাচরের সমস্ত গুপ্ত সম্পদকে মানুষের প্রতি ন্যস্ত করেছেন এবং এ অনন্য সম্মানসহায়ক উপকরণগুলিকে তাদের অনুগত করে দিয়েছেন। মানুষ এবং বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিগত মিল রয়েছে, যা তাকে সফল কর্মময় জীবন ও নতুন নতুন আবিষ্কার উপহার দিবে। বরং সীরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বৈষয়িক আবিষ্কার উদ্ভাবন তথা মানব জীবনের সমগ্র কর্মসুচিই আল্লাহর আনুগত্য ও তার ইবাদতের শামিল বলে গণ্য হবে।

বৈষয়িক উন্নতি ও ইসলামকে যারা পরস্পরবিরোধী এবং সাংঘর্ষিক হিসেবে চিত্রায়িত করতে চেষ্টা করে তারা মতলববাজ, প্রতারক চক্র। ভবঘুরে, দিশেহারা, পেরেশান মানুষ নির্জন প্রান্তরে দিগ্বিদিক ছুটাছুটির পর যখন কোন শুভাকাঙ্ক্ষী পথিকের ডাকে সাড়া দিয়ে ধ্বংসের কবল থেকে বের হয়ে আল্লাহর আশ্রয়ে ফিরে আসার উপক্রম হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে নির্দয়ভাবে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বিনাশের অতল গহ্বরে। সমাজে এমন কিছু সরল প্রকৃতির মানুষও আছে যাদের নিয়তে কোন ত্রুটি না থাকলেও তাদের পূর্ণাঙ্গ ধারণা ও গভীর জ্ঞানের অভাব আছে। তারা বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে মানুষের সফলতা দেখে মুগ্ধ। তারা মনে করে, মানুষের ঈমানী মূল্যবোধ ও বৈষয়িক উৎকর্ষ আলাদা আলাদা বস্তু। প্রত্যেকের ক্ষেত্র ভিন্ন, বৈষয়িক উন্নতি, প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি, ঈমানী মূল্যবোধে প্রভাবিত হয় না। সুতরাং তার প্রভাব বিস্তারে ঈমান থাকা না থাকা সমান। শরীয়তের বিধান মানা না মানায় কোন তারতম্য সৃষ্টি হয় না। এ ধারণা মোটেও ঠিক নয়। এরা আল্লাহর বিধি বিধান ও আইন কানুনের দুটি শাখাকে আলাদা আলাদা ভেবে নিয়েছে, যদিও বাস্তবে তা আলাদা নয়।

ঈমানী মূল্যবোধ মহাবিশ্বে মহান রাব্বুল আলামীনের চিরাচারিত বিধানের অংশবিশেষ মাত্র। এই উভয়ের ফলাফল পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। উভয়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার কোন কারণ নেই। এটাই সঠিক ধারণা যা আমরা কোরআনের ছায়াতলে অনুধাবন করেছি।

কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের গোমরাহীর কথা বর্ণনা দিয়ে বলেঃ

(ولَوْ أنَّ أهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. ولَوْ أنَّهُمْ أقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإنجِيلَ وَمَا أنزلَ إلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ)

"যদি আহলে কিতাবের লোকেরা ঈমান আনত এবং তাকাওয়া অর্জন করত তাহলে আমি গুনাহ মুছে দিতাম এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিতাম, যদি তারা তাওরাত ইঞ্জিল ও তাদের উপর নাজিলকৃত অন্যান কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনত, তাহলে তাদের উপর অনুগ্রহ এমন ভাবে বর্ষিত হত যেন তারা উপর থেকেও খেতে পারত আবার নিচ থেকেও খেতে পারত।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৫-৬৬)

আল্লাহ তা'আলা নুহ (সাঃ) জাতির প্রতি তার অঙ্গীকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّاراً. يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً. وَيُمْدِدْكُمْ بِأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنْهَاراً)

আমি অতঃপর তাদের বললাম তোমাদের প্রভূর কাছে ভিক্ষা চাও। তিনি মহান ক্ষমাশীল তিনি তোমাদের উপর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করবেন সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। তিনি তোমাদের জন্য নদ নদী প্রবাহিত করবেন। (সূরা নূহ ঃ ১০-১২)

আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিজস্ব অবস্থা ও প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জীবনে তাদের সাথে আল্লাহর আচরণের সঠিক চিত্র তুলে ধরে বলেন,

(إنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِمْ)

"আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয়।" (সূরা আল-রাদ: ১১)

নিশ্চয় আল্লাহর উপর ঈমান ও তার ইবাদতের উপর অটল থাকা তার জমিনে তারই বিধানের প্রতিষ্ঠা করা মূলতঃ সবটাই আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের শামিল। আল্লাহর সকল কল্যাণকর চিরাচরিত নিয়ম-নীতির উৎস অভিন্ন। যার বাস্তবমুখী উপকারিতার প্রমাণ আমরা ইতোমধ্যেই

পেয়েছি। কোন না কোন সময় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমী কোন দৃশ্য আমাদের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি করতে পারে। যখন আমরা দেখি প্রকৃতিপূজারীরা ঈমানী মূল্যবোধের তোয়াক্কা না করে বৈষয়িক উন্নতি সাধন করে চলেছে। এই বিভিন্নতার অশুভ পরিণামের ভয়াবহতা সূচনাতে অনুভূত না হলেও পরিশেষে নিশ্চিত ধবংসই তার জন্য অপেক্ষা করে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ ইসলাম ও মুসলমান।

ইসলামী সমাজ তখনই সমৃদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল যখন তারা ইসলামী মূল্যবোধ ও প্রাকৃতিক নিয়ম নীতির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করতে পেরেছিল। যতই এই উভয়ের মাঝে দূরত্ব বাড়ল ততোই তাদের অধঃপতন ত্বরান্বিত হল। আর যখন তারা উভয়টা থেকে সরে গেল তখন তারা চূড়ান্ত অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হল। পক্ষান্তরে বস্তু বাদী আধুনিক সভ্যতার তুলনা করা যেতে পারে, সেই হতভাগা পাখির সাথে, যার একটি পাখা ভেঙ্গে গেছে এবং তার আরেকটি বিশাল পাখার উপর ভর করে সে শূন্যে উড়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি আজ আধুনিক সভ্যতা যে পরিমাণ বৈষয়িক উৎকর্ষ সাধন করছে সেই পরিমাণ নৈতিক অবক্ষয় ও মানবীয় গুণাবলী থেকে বিচ্যুত হয়েছে। অভিজ্ঞ মহলের ভাষ্যমতে, আজকের বস্তুবাদী সমাজ উদ্বেগ, অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, বহুমুখী মানসিক ও শারীরিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

এ মরণব্যধী থেকে আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহর পথে ফিরে আসতে হবে এবং নৈতিকতা ও ঈমানী মূল্যবোধের চর্চাই ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে জীবন বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছে তা সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য প্রণীত সামগ্রিক আইনের অংশবিশেষ।

এই আইনের বাস্তবায়নের মধ্যে মানব চরিত্র ও মহাবিশ্বের চরিত্রের মধ্যে একটি মিল ও সামঞ্জস্য আছে। ইসলামী শরীয়ত মূলত ঈমানের সুফল। ঈমানকে বাদ দিয়ে এককভাবে শরীয়তকে কল্পনা করা যায় না। শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলমী সমাজ গঠন করা। ইসলাম পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরী হল তাকওয়া, পরিচ্ছন্ন অনুভূতি, দৃঢ়তা, উন্নত চরিত্র, সঠিক আচরণ-বিধির চর্চা, এটাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা

যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক নিয়ম ও ঈমানী মূল্যবোধের সামঞ্জস্য সৃষ্টি হতে পারে। এই দুটি বিধান আল্লাহর অমোঘ বিধানের এক একটি অংশ, যার ভিত্তিতে মহাবিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে।

মানুষ যেহেতু বিশ্বজগতের শক্তিশালী সদস্য সেহেতু তার কর্ম ইচ্ছা, তার ঈমান তার সততা-যোগ্যতা, তার এবাদত, কর্ম-তৎপরতা-সবটাই এই বিশ্ব চরাচরে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সব কিছুই সম্মিলিত ভাবে পরিপূর্ণ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দিতে সক্ষম হবে। এ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের ব্যঘাত ঘটলে এই নিয়ম নীতির বিরুদ্ধাচারণ করলে নিশ্চয় জীবনে বিপর্যয়, অবক্ষয়, বিশৃংখলা নেমে আসবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্ভোগ ও পেরেশানি ছড়িয়ে পড়বে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)

"এটি এ কারণে যে আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে যখন কোন নেয়ামত দান করেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের পরিবর্তন করেন না।" (সূরা আল আনফাল-৫৩)।

সূতরাং মানুষের কর্ম ও অনুভূতির সাথে আল্লাহর সার্বজনীন আইনের অধীনে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। একমাত্র মানবতার জাত শত্রুই এ প্রাকৃতিক সম্পর্ক ও স্বভাব গত সামঞ্জস্যের ব্যঘাত ঘটিয়ে মানুষ ও এলাহী নিয়মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে। মানুষকে হেদায়ত থেকে বঞ্চিত করে। সেক্ষেত্রে মানুষকে আল্লাহর পথের যেকোন বাঁধা বিঘ্নতা জয় করে সামনের দিকে দৃঢ়পদে এগিয়ে যেতে হবে।

আমি যখন কোরআনের ছায়াতলে আমার জীবনের অতি মূল্যবান সময়গুলো অতিবাহিত করছিলাম তখন আমার অন্তরে উদিয়মান অনুভূতি ভাবনার কিয়দাংশ তোমাদের জন্য ফী যিলাযিল কোরআনের ভূমিকা স্বরূপ পেশ করলাম। আশা করি আল্লাহ তা'আলা তা কারো হেদায়তের কারণ বানিয়ে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

(وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)

"আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কিছুই করতে সক্ষম নও। (সূরা আত তাকওয়ীরঃ ২৯)

আল-কুরআনের দাবী

মুহাম্মদ মোস্তাফা কামিল

আল-কুরআন ও মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা ঃ

আল-কুরআনের সাথে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নয়। কারণ আল-কুরআন মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। তাদের জীবনে কুরআন এখন গুরুত্বহীন একটি ধর্মীয় বইমাত্র। যার কার্যকারিতা ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। কুরআন নিয়ে তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে। কেউ বলে কুরআন অচল, আরব ও বর্বর সমাজে আবির্ভূত এ কিতাব আজকের সভ্য বিশ্বের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না। যুগ অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সমাজ অনেক এগিয়ে গেছে। এ সমাজ বিজ্ঞানের সমাজ, জাহিলিয়াত ও মধ্যযুগের ধর্মভিত্তিক সমাজের চাহিদা ইতোমধ্যে ফুরিয়ে গেছে।

আর একদল মুসলমান কুরআনের বাহ্যিক বিষয় নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আল-কুরআনের সুন্দর তিলাওয়াতই যেন সবকিছু। কে কত সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করল, মাদ্দ, গুন্নাহ, মাখরাজ, সিফাতে হুরুফ ইত্যাদি নিয়ে তারা যারপরনেই ব্যস্ত। কোটি কোটি মুসলমানের ঘরে কুরআন নেই। যাদের ঘরে আছে, তাদের মধ্যে অসংখ্য মানুষ আল-কুরআন পাঠ করে না, পড়তে জানে না। পড়তে জানলেও শুদ্ধ করে পড়তে পারে না অথবা অর্থ বুঝে না, বোঝারও চেষ্টা করে না। কুরআন পাঠ করে বরকতের উদ্দেশ্যে, জ্বিন তাড়ানোর জন্য বা ঝাঁড়-ফোঁক, মন্ত্র ও তাবিজ হিসেবে। কুরআনকে বুঝার জন্য, হিদায়াতের জন্য গবেষণা করে না। কুরআন যেন তাদের জীবনে বাড়তি বোঝা। মাঝে মাঝে দাওয়াতী হুজুরকে ডেকে খতমে কুরআন, খতমে গাউছিয়া, খতমে জালালী, খতমে বুখারীর ব্যবস্থা করে জীবনের যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা ধুয়ে মুছে সাফ করে নেয়ার অযথা চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে কুরআন তাবিজের কিতাবে পরিণত হয়েছে। অনেকে বড় বড় হুজুর সেজে তাবিজের পসরা সাজিয়ে বসে গেছেন। আল-কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হয়ে গেছেন। তারা কুরআন নিয়ে গবেষণা করেন না, আল-কুরআনের বিধি বিধান মেনে চলেন না।

এ অবস্থা শুভ নয়। এ অবস্থা আমাদের ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করবে। এ পথ পতনের। কুরআন বিমুখতা ঈমান-বিশ্বাসের কবর রচনা করবে। ইতোপূর্বে আমাদের সকল উন্নতি-সমৃদ্ধির পিছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল আল-কুরআন। যখনই আমরা কুরআন থেকে বিচ্যুত হয়েছি, আমাদের পতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা বেশিদিন চলতে দেয়া যায় না। জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব টিকবে না। এখনও সময় আছে সতর্ক হওয়ার।

আল্লাহ্ বলেছেন :

(أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)

"তারা কি কুরআন গবেষণা করে না? নাকি তাদের হৃদয়ে তালা পড়ে গেছে?" (সূরা মুহাম্মদ : ২৪)

তিনি আরো বলেন :

(كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ)

"আমি বরকতময় কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তারা তার আয়াতসমূহ গবেষণা করতে পারে এবং বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা ছোয়াদ : ২৯)

সুতরাং কুরআন পাঠ করতে হবে, বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে হবে। আল-কুরআনকে বুঝার উদ্দেশ্যে, কুরআনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অব্যাহতভাবে কুরআনের গবেষণা চালু রাখতে হবে। কুরআনের হুকুম আহকাম, হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ ও মহাবিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ও আমাদের সৃষ্টিতে আল্লাহর যে বিস্ময়কর নিদর্শন আছে, তা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ বলেন :

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ)

"আমি তাদেরকে মহাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ও তাদের নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান আমার নিদর্শনাবলী দেখাব, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, তিনি সত্য।" (সূরা ফুসসিলাতঃ ৫৩)

আমাদের সকলকেই কুরআনের উপর আমল করতে হবে, আল-কুরআনের আলোকে জীবন সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন :

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن, و العمل بهن. (رواه الطبري)

"আমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের দশটি আয়াত শিখত, তার অর্থ না বুঝে এবং তার উপর আমল না করে ছাড়ত না।" (তাবরী)

আল-কুরআনকে একসাথে নাযিল না করে অল্প অল্প করে নাযিল করার পিছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল-কুরআনের গবেষণার পথ সুগম করা, কুরআন বুঝা সহজতর করা। জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে তুচ্ছ বিষয়ে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠত। সভ্যতা, সংস্কৃতি বলতে কিছুই ছিল না। ইসলামের ছায়াতলে আসার কারণে কুরআন তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। তাদের জীবন যাপন, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের ছাপ এনে দিয়েছিল। তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য কুরআনের আলোকে জীবন সাজিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহর জন্য যে কোন বস্তু ত্যাগ করতে তারা দ্বিধা করত না।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) লিখেন, যখন এ আয়াত

(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)

"তোমাদের পছন্দনীয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না।" (আলে ইমরান : ৯২)

তখন আবু তালহা নামক একজন সাহাবী রাসূল (সা.) এর দরবারে এসে আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় 'বিরহা' নামক বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করতে চাই। এটার পরিবর্তে আল্লাহর রেজামন্দি ও পরকালের মুক্তি কামনা করছি। এ বাগান আপনি যাকে ইচ্ছা দান করুন। তখন রাসূল (সা.) আনন্দিত হয়ে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন।

হযরত ওমর (রা.) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলকে (সা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! খায়বারে প্রাপ্ত আমার বাগানের অংশটি আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ, তার ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দিন। রাসূল (সাঃ) বললেন,

حبس الأصل و سبل التمرة (إبن كثير و اللؤلؤ و المرجان)

"আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দাও।" (ইবনে কাসির, লুলুওয়াল মারজান) এভাবে দেখা যায়, রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য কত আগ্রহী, কোরআনের উপর আমল করার জন্য কত বেশি অগ্রসর ছিলেন! তাঁদের দুনিয়ার টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি আখিরাতের সামনে নগণ্য ছিল। কোরআনের বিধানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর ছিলেন। এটাই ছিল তাদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। আমরা আশা করব মুসলিম সমাজ নিজেদের ভুল বুঝতে সক্ষম হবে। কুরআনকে আবারো তাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে।

কুরআনের ফজিলত ঃ

আল-কুরআন আল্লাহর আলৌকিক কিতাব যা শেষ নবী মুহাম্মদ (স.) এর ওপর জিব্রারাইল আমিন (আ.) এর মাধ্যমে নাযিল করা হয়। যা আমাদের কাছে সন্দেহাতীতভাবে পৌছেছে। যার তেলাওয়াত পুণ্যের কাজ। যা সূরা ফাতেহা দিয়ে শুরু করে সূরা নাসের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে।

কুরআনের ফজিলত ও মর্যাদায় অনেক কুরআনের আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কুরআন শিক্ষা নেয়া, শিক্ষা দেয়া, কুরআন চর্চা করা, কুরআনকে বিশুদ্ধভাবে পড়া ও কুরআনকে মুখস্ত করার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে করিমায়।

আল-কুরআনের অনেক আয়াত কুরআন গবেষণার প্রতি মুমিনদেরকে উৎসাহিত করেছে। কুরআনের আহকাম ও বিধি-বিধানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং কুরআন করিম পাঠ করা হলে মনযোগ সহকারে বুঝার উদ্দেশ্যে শ্রবণ করার আদেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)

"যখন কুরআন পাঠ করা হয় তা মনযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, তাহলে আল্লাহর রহমত তোমার উপর নাযিল হবে।" (সূরা আল-আরাফ : ২০৪)

কুরআন গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করে আল্লাহ বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"তারা কি কুরআন গবেষণা করে না? নাকি তাদের হৃদয়ে তালা এঁটে দেওয়া হয়েছে?" (সূরা মুহাম্মদ : ২৪)

কুরআনের তিলাওয়াতকে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে আখ্যায়িত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ)

"যারা আল্লাহর কিতাবের তিলাওয়াত করে, নামাজ কায়েম করে, আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে প্রকাশ্যে-গোপনে তাঁর পথে খরচ করে, তারা লাভজনক ব্যবসার আশা রাখে।"(সূরা ফাতির : ২৯)

বোখারী শরিফের বর্ণিত হাদিসে রাসুল করিম (স.) বলেন:

قال رسول الله ـ صلي الله عليه و سلم ـ خيركم من تعلم القرآن و علمه .
(رواه البخاري)

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বপেক্ষা উত্তম যে কুরআন শিখে এবং শিক্ষা দেয়।" (বুখারী)

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (স.) বলেন:

و قال صلوات الله عليه أيضا : الماهر بالقرآن مع السفرة االكرام البررة و الذي يقرأ القرآن و يتعتع فيه و هو عليه شاق له أجران (رواه مسلم)

"কুরআন পড়ায় অভিজ্ঞ, পারদর্শী ব্যক্তির হাশর পূত-পবিত্র সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে হবে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ভাবে কোরআন পড়তে পারে না। কুরআন পাঠ তার উপর কষ্টসাধ্য সে দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হবে।" (মুসলিম শরীফ)

و قال الرسول الله ـ صلي الله عليه و سلم ـ أيضا : أشراف أمتي حملة القرآن. (رواه الترمذي)

"আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হল কুরআনের পাঠক ও ধারক-বাহক।" (তিরমিযি)

তিরমিযি শরিফে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) আরো বলেন:

و قال الرسول الله ـ صلي الله عليه و سلم ـ أيضا : اقرء القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. (رواه الترمذي)

"কুরআন পড়তে থাক, কারণ কুরআন তার পাঠকদের জন্য কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।" (তিরমিজী)

তিনি আরো বলেন,

قال ايضا : إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم.
(متفق عليه)

"নিশ্চয়ই এ কুরআন আল্লাহর পরিশীলনাগার। সাধ্যমত তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।" (বুখারী, মুসলিম)

মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ। বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য, তাদের শারিরিক, আধ্যাত্মিক যাবতীয় রোগ-ব্যধির নিরাময় হিসেবে নাযিল করেছেন।

আল্লাহ বলেন :

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)

"হে মানবসকল! অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে বহু উপদেশ এসেছে যেগুলো তোমাদের অন্তরের ব্যাধির নিরাময়, প্রতিষেধক এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ।" (সুরা ইউনুস ঃ ৫৭)

তিনি আরো বলেন,

(قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ)

"আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আলোকবর্তিকা এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।" (আল মায়েদা ঃ ১৫)

আল-কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য ঐশী সুসংবাদ, হিদায়ত এবং হেরার জ্যোতি জাহেলিয়াতের নিকষ কালো আঁধারে নিমজ্জিত পথহারা মানবতার হিদায়তের মশাল, যা পথহারা জাতিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

তিনি আরো বলেন,

(مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)

এমন কিতাব এসেছে, যা তোমাদের মাঝে বিদ্যমান কিতাবের সত্যায়ন করে এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত বা পথনির্দেশিকা ও সুসংবাদ স্বরূপ।" (সূরা আলবাক্বরাহ : ৯৭)

আল্লাহ জোর দিয়ে বলেছেন, কুরআন সঠিক পথের সন্ধান দিবে।

(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا)

"নিশ্চয়ই কুরআন নির্ভুল পথের সন্ধান দেয় এবং কুরআন সৎকর্মশীল বিশ্ববাসীদেরকে এ বলে সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে।" (সূরা আল-ইসরা : ৯)

বরকতময় আল্লাহ্ যিনি তার বান্দার ওপর বিশ্ববাসীকে সতর্ককরণের জন্য ফুরক্বান নাযিল করেছেন। যেহেতু আল-কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ ঐশী বাণীর সমাপ্তি টেনেছেন এবং এই কিতাবকে প্রলয়কাল পর্যন্ত আগত অনাগত সকল মানব জাতির গাইডবুক হিসেবে প্রেরণ করেছেন, সেহেতু

তার হিফাজতের দায়িত্বও নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। তাকে বাতিলের সব ধরনের ছোবল থেকে অক্ষত রাখার দায়িত্ব নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)

"নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি, তার হিফাজতের দায়িত্ব আমার হাতেই রেখে দিলাম।" (সূরা আলহিজর : ৯)

তবে মানব জাতির হিদায়াত, হিফাজত, উন্নতি, সমৃদ্ধি সবটুকুই আল-কুরআনকে অনুসরণ করা না করার উপর নির্ভরশীল। আল-কুরআনই একমাত্র তাদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। মানবরচিত সকল মতবাদ, মতাদর্শ, ইতোমধ্যে এক্ষেত্রে অক্ষম, অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কারণ কুরআন সহজাত নিয়ম-নীতির প্রতি মানুষকে আহ্বান করে থাকে যা মহাবিশ্বের সমস্ত সৃষ্টি প্রাকৃতিকভাবে মেনে চলছে।

(أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)

"সত্য অস্বীকারকারী দল কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোন দ্বীন অনুসন্ধান করে? অথচ আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তারা সকলেই আল্লাহর দ্বীনের অনুগত।" (সূরা আলে ইমরান : ৮৩)

আল কুরআনের সাহিত্যিক মান ঃ

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ কিতাব নাজিল করে তাঁর বিশুদ্ধতা, চিরন্তন বিধান ও সাহিত্য মান সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

(ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ)

"এটি এমন একটি কিতাব যার মাঝে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই"। (সূরা বাক্বারা : ২)

পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ নেই যার রচয়িতা তার গ্রন্থ সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

(وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ)

"তোমরা যদি আমার কিতাব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো, তবে তার মত (অন্য আয়াতে- তার মত একটি কিতাব অথবা দশটি সূরা, সর্বশেষ চ্যালেঞ্জ তার মত) একটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং এতে আল্লাহ ব্যতিত দুনিয়ার মাঝে তোমাদের যত সহযোগী আছে সকলের সহায়তা নাও"। কিন্তু তারা আল্লাহর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারল না। (সূরা বাক্বরা: ২৩)

তার চ্যালেঞ্জ শুধু ঐ সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। আজও মিসর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, প্রভৃতি দেশে আরবী বংশজাত বহু খৃষ্টান ও ইয়াহুদী পরিবার বর্তমান। ইচ্ছা করলে তারাও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারে; কিন্তু পূর্ববর্তীদের মত তাদের ভাগ্যেও হতাশা ছাড়া আর কিছু জুটবে না। যারা আরবী ভাষায় পন্ডিত এবং যাদের মাতৃভাষা আরবী তারা এটা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে যে, কুরআনের ভাষার সাথে মানবরচিত কোন আরবী পুস্তকের ভাষার কোন তুলনাই হয় না। বরং নবী করিম (স.)-এর ভাষাও কুরআনের ভাষার ন্যায় উচ্চ মানের ছিল না। নবুওয়ত প্রাপ্তির পরও সাধারণভাবে নবী (স.) ওহীর বাণী ব্যতীত যেসব কথা বলেছেন তাও ছিল কুরআনের ভাষা হতে নিম্ন মানের। ওহীর ভাষার সাথে তার তুলনাই হয় না। অথচ রাসূল (স.) নিজেই বলেছেন,

أنا أفصح العرب و لافخر.

"আমি সমগ্র আরবী ভাষাভাষী বাগ্মীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ।" এটিই বাস্তব সত্য। জাত্যাহংকার নয়।"

রাসূল আরো বলেছেন,

أدبني ربي فأحسن تأديبي.

"আমার প্রভূ আমাকে শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং উত্তম শিষ্টাচার শিখিয়েছেন।"

সুতরাং কুরআন যে আল্লাহর কিতাব, তার উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মান, সুনিপুন শব্দ-চয়ন, গঠন প্রণালী, অভিনব বাক্য বিন্যাস আর মর্মস্পশী সুরঝংকার প্রভৃতিই অকাট্য প্রমাণ।

আল-কুরআনে তার পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে:

(ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئ)

"অর্থাৎ কুরআনে সকল ব্যপারে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।" (সূরা আল নাহাল : ৮৯)

যেমন- ঐতিহাসিক গীবন বলেছেনঃ

"জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের কার্যকরী বিধান আল-কুরআনে রয়েছে।"

কুরআনে পরিবার থেকে শুরু করে আন্তজার্তিক পর্যায় পর্যন্ত এমনকি বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক নীতিমালাসমূহ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, আল-কুরআন আল্লাহর কিতাব। কেননা যে নবীর মুখ থেকে আমরা এগুলো পেয়েছি তিনি ছিলেন উম্মি। সুতরাং তিনি কোন আইনের কিতাবও অধ্যয়ন করেননি, কিংবা কারো কাছে কোন পাঠও গ্রহণ করেননি। নবী না হলে তাঁর পক্ষে এই চমৎকার বিধানাবলী পেশ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বলতে পারি আল-কুরআনই পৃথিবীতে একমাত্র গ্রন্থ যাতে সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে আলোকপাত হয়েছে। এর ব্যপকতা অত্যন্ত সম্প্রসারিত।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ওয়ালীদ ইবনে মুগিরাহ (জাহেলী যুগের বিদগ্ধ সাহিত্যিক) রাসূলের দরবারে আসলেন, রাসূল (স.) তাঁকে কুরআন পড়ে শোনালেন, কুরআন শুনে তিনি প্রভাবিত হলেন, এ খবর আবু জেহেল শোনে ছুটে আসে তার কাছে এবং বলে, আপনার গোত্র আপনার জন্য অঢেল সম্পদের ব্যবস্থা করবে, বিনিময়ে আপনার কাছে

মুহাম্মদের বিরোধিতা চাচ্ছে। তিনি বলেন, সম্পদের লোভ আমার নেই বললেই চলে। কারণ আমি কুরাইশ বংশে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী।
তখন আবু জেহেল বলে, "তাহলে আপনি এমন কিছু বলুন, যাতে বুঝা যাবে যে আপনি কুরআন অস্বীকার করেন।"
তিনি বলেন, "কি বলব বুঝতে পারছি না আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষাজ্ঞানী ও সাহিত্য সমালোচক। তাঁর বাণী পদ্যে-গদ্যে কারো পদ্য-গদ্যের সাথে সাদৃশ্যতা নেই।

وو الله إن لقوله الذي يقوله حلآوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه ، مغدق أسفله، وإنه ليعو ولايعلي ، وإنه ليحطم ما تحته، قال:لايرضي عنك قومك حتي تقول فيه ، قال: قف عني حتي أفكر فيه، فلما فكر قال:إن هذا إلا سحر يؤثر، يأثره عن غيره ، فنزل قوله تعالي: (ذرني ومن خلقت وحيدا...إنه فكر و قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدرثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبرفقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر). (سورة المدثر: 11- 25)

"আমি মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় তাঁর বাণীতে অলংকরিক আকর্ষণ ও সজীবতা আছে। এবং তাঁর বাণী উপরে নিচে সর্বাঙ্গীন সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও উপকারী এবং তাঁর বিজয় সুনিশ্চিত।"
জাহেলী যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ কুরআনের ব্যাপারে এ মন্তব্য করেছেন এবং তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, এ কিতাব একটি অস্বাভাবিক কিতাব, যার সাহিত্যিক মান, সুনিপুন শব্দ-চয়স, সুদৃঢ় বাক্য-গঠন প্রণালী, হৃদয়গ্রাহী সুরঝংকার ইত্যাদি তা (কুরআন) আল্লাহর বাণী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ জাহেলী যুগের কবি সাহিত্যিকগণ তাদের সঠিক রুচিবোধ ও অবিকৃত সহজাত্যের মানদন্ডে সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, কুরআন মানবরচিত কোন বই-পুস্তক নয় বরং অদৃশ্য শক্তির পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ঐশী বাণী। সে জন্য দেখা গেছে সরলমনা সাহিত্যপ্রেমী বেদুইনরা অনেক সময় কুরআনের অলৌকিক উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মান দেখে কোরআনের স্রষ্টার সম্মানে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দাবী

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানব জাতির প্রতি মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ ঐশী প্রত্যাদেশ। ইসলামের চিরন্তন মুজিজা, যার অলৌকিকত্ব চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। তার শৈল্পিক সৌন্দর্য, সাহিত্যিক মান, আরব দেশের কবি সাহিত্যিকদের মুগ্ধ করেছে। তার মত কিতাব রচনা করতে সক্ষম হয়নি এবং নির্দ্বিধায় একথা ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছে যে, এটা মানুষের রচিত কোন গ্রন্থ নয়।

আল-কুরআন আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত ও আন্দোলনের গাইড বুক। এই গ্রন্থ দাওয়াত ও আন্দোলনের উৎস। এই গ্রন্থ ইসলামী মিশনের রক্ষক ও বিশ্লেষক। এটি ইসলামী আন্দোলনের শক্তির উৎস। আল-কুরআন নিছক কোন ধর্মগ্রন্থের নাম নয়, যার তেলায়াত ও শ্রবণের বরকত হাসিল করলেই যথেষ্ট হবে ও দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্মের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। এই গ্রন্থ মানব সমাজে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা ও সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য নাযিল করা হয়েছিল। জীবন্ত মানুষ ও তাদের বাস্তব ঘটনাবলীর মোকাবিলা করা ও তাদের পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য নাযিল হয়েছিল।

মানব সমাজে উদ্ভূত প্রতিটি সমস্যার সুন্দর ও যৌক্তিক সমাধান দিয়ে তাদের জন্য একটি শান্তির নীড় রচনা করেছিল। বস্তুত কোরআনের অলৌকিকত্ব এখানেই নিহিত।

আল-কুরআন একটি সুনির্দিষ্ট জাতির ইতিহাসের ধারা পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং তাদের উপহার দিয়েছিল একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা এবং এমন একটি জীবন বিধান তাদের উপহার দিয়েছিল যা সর্বাঙ্গীন সুন্দর। যার বাস্তব রূপ ছিল স্বয়ং মুহাম্মদ (স.) এর তেইশ বছরের নবুয়াতী জীবন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (র.) বলেন, كان خلقه القران

"রাসূলের আদর্শ ছিল বাস্তব কুরআন।" (মুসলিম শরীফ, আহমদ, নাসায়ী)

পবিত্র কুরআন আল্লাহর বিধান, মানব জাতির জন্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। রিসালতের শুভ সূচনা থেকে সুন্দর সমাপ্তি পর্যন্ত যত ঐশী প্রত্যাদেশ নাযিল হয়েছিল, সে ধারাবাহিকতার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রূপই হচ্ছে আল-কুরআনুল করিম। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন কিতাব নাযিলের প্রয়োজন দেখা দিবে না। কিয়ামত পর্যন্ত আগত অনাগত সকল

জাতি-গোষ্ঠীর সামনে কুরআন চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে যে, কুরআন অনন্য এবং যার রহস্যময়তা অনতিক্রম্য এবং বিকল্প সৃষ্টি করা মানবীয় প্রজ্ঞার আওতাবহির্ভূত।

কিয়ামাত পর্যন্ত মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি যত অগ্রসর হবে, কুরআনের অশেষ রহস্যও সে পরিমাণেই মানুষের সামনে উন্মুক্ত হতে থাকবে। প্রতিটি প্রজন্মের সামনে পবিত্র কুরআনের সেসব অলৌকিকত্ব ও রহস্যময় তার দ্বার একে একে উন্মুক্ত হতে থাকবে।

কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য, তার সাহিত্যমান চরম বিস্ময় হয়ে আছে। অতীত, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের বিভিন্ন বিষয়ে কুরআনের আগাম বাণী সারা বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

বর্তমান কালের বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও আল-কুরআন এক অলৌকিক জ্ঞানের মহাসাগর এবং কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে মিল ও সামঞ্জস্যতা যে কোন বিচারে বিস্ময়কর। এক্ষেত্রে আল-কুরআন বিশ্ববাসীর সামনে একটি চ্যালেঞ্জ। আজকের বিজ্ঞানী মানুষ এ পর্যন্ত যা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, এমনকি যেসব প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষের অনুধাবন শক্তি নির্বাক হয়ে আছে, সেসব জটিল প্রশ্নের উত্তর পবিত্র কুরআন প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বলে দিয়েছে।

আল-কুরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম। আল-কুরআন একটি চালিকাশক্তির নাম, সর্বোপরি আল কুরআন একটি আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ কালো আঁধারে নিমজ্জিত মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদম সন্তান, নবীকুলের শিরোমণি মুহাম্মদ (স.) এর ওপর এই কিতাব পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে অবতীর্ণ হয়।

সুতরাং এই গ্রন্থ থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কিতাবের প্রদর্শিত সেই মহানবীর আদর্শকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে হবে।

আল-কুরআনের বিধান চিরন্তন :

বস্তুত আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান মহাবিশ্বের মতোই কুরআন এক চিরঞ্জীব সত্য বাণী। বিশ্ব প্রকৃতি হচ্ছে আল্লাহর দৃশ্যমান গ্রন্থ। আর কুরআন হলো পঠিত গ্রন্থ।

এই উভয় গ্রন্থ তাদের স্রষ্টার অস্তিত্ব ও অসীম ক্ষমতার জীবন্ত সাক্ষী, উভয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মের জন্যই সৃজিত।

প্রকৃতি তার সমস্ত গুণ, বৈশিষ্ট্যে সুসজ্জিত হয়ে নিজের জন্য নির্ধারিত কাজে তৎপর রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীসহ সকল গ্রহ, নক্ষত্র সৃষ্টির আদি থেকেই আপন দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত। মুহূর্তের জন্যেও তারা কখনো নিজ দায়িত্ব পালন থেকে বিরত হয়নি, বিধায় প্রকৃতির চলনে কোন ধরনের ব্যাঘাত, বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়নি। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে মহান আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত। ঠিক তেমনি আল-কুরআন আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান। আল্লাহ্ বলেন,

(فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)

"এটাই আল্লাহর সহজাত বিধান, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন" (সূরা রূম : ৩০)

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلا (٤٣)

"আল্লাহর স্বভাবের কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।" (সূরা ফাতির : ৪৩)

কুরআন মানুষকে তার অপরিবর্তনীয় স্বভাব প্রকৃতির দিকে আহ্বান করে।

আল্লাহ আরো বলেন,

(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً)

"সাত আসমান, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তা'আলার তসবীহ পাঠ করে। এ সৃষ্টে এমন কোন বস্তু নেই যা তার

প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ পাঠ বুঝতে পারো না।" (সূরা বনি-ইসরাঈল : ৪৪)

আল-কুরআন মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের সকল সমস্যার সুন্দর ও যৌক্তিক সমাধান দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তার সেই সঞ্জীবনী শক্তি এখনও তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে, প্রলয়কাল পর্যন্ত থাকবে। কারণ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব এবং তার স্বভাব, প্রকৃতি মহাবিশ্বের প্রকৃতির মতোই চিরন্তন, চিরসচল। চন্দ্র, সূর্যের ব্যাপারে যদি কেউ একথা বলে যে এটা প্রাচীন, রক্ষণশীল, সেকেলে গ্রহ, নক্ষত্র, এবং তার স্থলে অন্য নতুন প্রগতিশীল গ্রহ, নক্ষত্র আবশ্যক অথবা মানুষ একটি প্রাচীন রক্ষণশীল প্রাণী এবং তার পরিবর্তে পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য নতুন আধুনিক প্রগতিশীল প্রাণী সৃষ্টি করা প্রায়োজন, তবে এ মন্তব্য যেমন হাস্যকর প্রমাণিত হবে, তেমনি মানব জাতির প্রতি প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ বিধান আল-কুরআন সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা হাস্যকর।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন চিরন্তন। স্থান ও কালের বন্ধনমুক্ত। কুরআনের আহকাম কোন নির্দিষ্ট জাতির জন্য নাযিল করা হয়নি। কুরআনের আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারামের বিধি-বিধান কোন নির্দিষ্ট প্রজন্ম, সময়, স্থান-কাল-পাত্রের সাথে সীমবদ্ধ নয় যে, সময় ফুরিয়ে গেলে, প্রজন্ম কালের আবর্তনে হারিয়ে গেলে কুরআনের চাহিদাও ফুরিয়ে যাবে।

এ ধারণা অন্যান্য আসমানী কিতাবের ক্ষেত্রে সঠিক হলেও কুরআনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবাস্তব। কুরআন কালজয়ী, তার বিধি-বিধান চিরন্তন। কুরআন আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ ঐশী কিতাব। শেষ নবীর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী বিধান। এরপর আর কোন ঐশী কিতাব প্রেরণ করবেন না বিধায় এ কিতাবকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়েছে এবং এর হিফাজাত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে তুলে নিয়েছেন। প্রলয়কাল পর্যন্ত এ কিতাব মাহফুজ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ কুরআনকে যাবতীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন, তাহরীফ-তাবদিল থেকে রক্ষা করেছেন।

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)

"আমিই কুরআন নাযিল করেছি। কুরআনকে হিফাজাতের দায়িত্ব আমার হাতে তুলে নিলাম।" (সূরা হিযর : ৯)

কিন্তু অন্যান্য আসমানী কিতাবের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা হিফাজাতের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে না নিয়ে জাতির উপর অর্পণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

(بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ)

"আল্লাহ ততটুকই মাত্র হিফাজাত করেছেন যতটুকু তারা নিজেরা হিফাজাত করেছিল।" (সূরা আল-মায়েদা : ৪৪)

আল্লাহ তা'আলা কুরআন হিফাজাতের বহুমুখী ব্যবস্থা নিয়েছেন। খাতায় কলমে, মুসলমানদের বক্ষে রক্ষণাবেক্ষণের অলৌকিক ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কালজয়ী এ ঐশী কিতাব চির অম্লান হয়ে থাকবে। তার বিধি-বিধান সর্বকালের সর্বস্তরের মানব সমাজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

আল-কুরআনকে ইতিহাসের আঁকে-বাঁকে মানব সমাজে বহুবার সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। এ কুরআন আমাদের উপহার দিয়েছিল সুন্দর সমাজ, অনাবিল শান্তির নীড়। যেখানে অশান্তি, হানাহানি, সন্ত্রাস, বিশৃংখলা ছিল না। মানব জাতি ফিরে পেয়েছিল তাদের ন্যায্য অধিকার। নিশ্চয়তা পেয়েছিল জান, মাল ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার। যে সমাজে আবালবৃদ্ধবনিতা ছিলো। ছিলো মহিলা-পুরুষ, শিশু, যুবক-যুবতী, আপামর জনসাধারণ। সর্বস্তরের মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। রাসূলে করিম (স.) এর তেইশ বছরের নবুয়তী জিন্দেগীর প্রতিটি মূহুর্তে মাদানী সমাজে সংঘঠিত ঘটনা প্রবাহের আলোকে ধাপে ধাপে কুরআন নাযিল হয়েছিল। সমাজে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দিয়ে একটি সুখী সমাজ উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিল। কুরআনের সমাধানের আলোকে এক সর্বাঙ্গীন সুন্দর, সমৃদ্ধশালী, শ্রেষ্ঠ সমাজের স্বাদ তারা নিতে পেরেছিলো। সেদিন যদি

কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী সমাজ উপহার দিতে পারে, আজকে পারবেনা কেন?

আমাদের বিশ্বাস কুরআনের মধ্যে এখনও সে সজীবতা, কার্যকরি শক্তি বিদ্যমান আছে। কারণ মানব সমাজের মৌলিক সমস্যাসমূহ সব সময় অভিন্ন হয়ে থাকে। যদিও তার প্রকাশের ধরন, স্থান, কাল, সমাজ, জাতি ভিন্ন হয়। মানব সন্তান হিসেবে আমরা সব সময় মৌলিক কিছু অভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করে থাকি। তা আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি বৈকী! মৌলিক সমস্যাগুলি যেমন কুফূরী, নিফাক্ব, শিরক, বিদআত, অশ্লীলতা, জেনা, ব্যভিচার, জুলুম, অত্যাচার, সন্ত্রাস, ফাসাদ ইত্যাদি এ সমস্যাগুলো আবহ্মান কাল থেকে মানব সমাজে ছিল, কমবেশি থাকবে। তবে এগুলো বিভিন্ন সমাজে প্রকাশের ধরণ আলাদা। নতুন লেবাসে নতুন পোশাকে উপস্থিত হয়। তাই বলে সমাধান ভিন্ন হবে না। আল কুরআনের দেয়া ইনসাফভিত্তিক যৌক্তিক সমাধানই এ থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। তাতেই নিহিত রয়েছে মানব সমাজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি।

আল-কুরআনের মূল চেতনা :

আল-কুরআন মূলতঃ মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাওহীদের মর্মবাণী প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছে। রাসূল (সা.) বলেন,

"قولوا لا اله الا الله تفلحون"

"বল আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই সফলকাম হবে।"

জীবন সুন্দর হবে, সমৃদ্ধ হবে। এ কালেমা তাইয়্যেবা পৃথীবির বুকে সর্বাপেক্ষা সত্যবাণী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ)

"একটি ভাল কথা একটি ভালো গাছের মতো যার শিকড় সুদৃঢ় এবং তার শাখা প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত।" (সূরা ইব্রাহীম : ২৪)

কী উপমা! এমন উপমা কি আপনার মনকে নাড়া দেয় না? একটি ভালো কথা ভাল গাছের মতো। সেই গাছটির মত মাটির গভীরে যার অবস্থান। শাখা বিস্তার করে দিয়ে সে মানুষের জন্য ছায়া ঘেরা নিসর্গ তৈরি করে রেখেছে। বারো মাস সে সরবরাহ করে যায় ফল আর ফল। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যার গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে, যার প্রত্যেকটি কাজ কর্ম আচরণ ঈমানী ফলগুধারা বয়ে যাবে। সারাটি জীবন ঈমানী বৃক্ষের সুস্বাদু ফলের স্বাদ, মজা নিতে থাকবে, যে ঈমানী বৃক্ষের শীতল ছায়ায় স্বর্গীয় জীবনের অমৃত স্বাদে তার জীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর আর সৌভাগ্যবান হয়ে উঠবে।

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এ ঘোষণাটি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এ ঘোষণার গভীর প্রভাব তার দৈনন্দিন জীবনের কাজ কর্মে পরিলক্ষিত হবে। একজন মুমিনের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে, বদলে যাবে। প্রত্যেকটি কাজ-কর্মে, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সিদ্ধান্ত নিতে সেই ঈমানী ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পদক্ষেপ নিবে।

যে ব্যক্তির সমগ্র চেতনা জুড়ে আল্লাহর অস্তিত্বের এরূপ একটি বিশ্বাস বিদ্যামান আছে যে, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, সেই ব্যক্তির জীবন যাপনের নীতি ও পদ্ধতি হবে অন্য বাতিল আকীদায় বিশ্বাসী ও মতাদর্শীদের জীবন পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, একেবারেই ভিন্ন।
বস্তুতঃ সুস্পষ্ট নির্ভেজাল তাওহীদ যেখানে বিদ্যমান আছে সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত বা দাসত্ব চলতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া আর কারো সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে না।
আল্লাহ্ বলেন,

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)

"একমাত্র তোমারই ইবাদত করছি। একমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করছি।" (সূরা ফাতেহা : ৪)
আমরা প্রত্যেক নামাযে যার প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। আল্লাহ ছাড়া আর কারোর আইন, বিধান, উপদেশ, পথ-নির্দেশনা জীবনের কোন বিষয়ে কোন আচরণে কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য-চর্চা, নীতি-নৈতিকতা, আদব, আখলাক, শিষ্টাচার, সামাজিক বা অর্থনৈতিক লেনদেন তথা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান তার সামনে থাকবে। তাকে অনুসরণ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করে যাবে।
পক্ষান্তরে বাতিল মতবাদ ও মতাদর্শগুলোতে যারা বিশ্বাসী তাদের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গন্তব্য থাকে না। হালাল-হারামের কোন ভেদ-বিচার থাকে না। ভাল-মন্দের কোন ভেদাভেদ থাকে না। কেননা মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম আচার-আচরণ, আক্বীদা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এখানেই মূল পার্থক্য।
সঠিক আকীদা বিশ্বাস জানতে হলে, বিশুদ্ধ ঈমান চর্চা করতে হলে কুরআন গবেষণায় মনোনিবেশ করতে হবে। কুরআন চর্চা করতে হবে। কুরআনকে বুঝতে হবে। কুরআন অনুসারে আমল করতে হবে। আমাদের সুন্দর অতীতের শৌর্য-বীর্য আবার পুনরুদ্ধার করতে হলে, ইসলামী স্বর্ণ যুগের স্বাদ আবারো পেতে চাইলে কুরআন চর্চা, তার উপর আমলের বিকল্প নেই। যাতে কোরান পরকালে আল্লাহর সামনে তার পাঠক ও চর্চাকারী, সর্বোপরি কুরআনের আলোকে জীবন ধারণকারীদের পক্ষে সুপারিশ করবে। তাদের

মুক্তির জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে ধর্ণা দিবে এবং তাদের মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে ছাড়বে।

রাসূল (স.) বলেন,

"إقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه"

“কুরআন পড়তে থাক, কারণ কুরআন তার পাঠকদের জন্য কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।” (তিরমিজী)

"القرآن حجة لك أو عليك"

“কুরআন তোমার পক্ষে দলিল হতে পারে, আবার বিপক্ষেও দলিল হতে পারে,

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالي- :" من لم يقرإ القرآن فقد هجره ، ومن قرأ القرآن ولم يتدبر في معانيه فقد هجره ، ومن قرأ و تدبر و لم يعمل بما فيه فقد هجر"

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন,

যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না সে কুরআন ছেড়ে দিয়েছে। কুরআন পাঠ করে তার অর্থ বুঝার চেষ্টা করেনি সে কুরআন ছেড়ে দিয়েছে এবং যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে, তার অর্থ বুঝেছে কিন্তু তার উপর আমল করেনি সেও কুরআন ছেড়ে দেওয়াদের মধ্যে শামিল হয়েছে।

এদিকে ইঙ্গিত করে মহান রাব্বুল আলামিন বলেছেন,

(وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً)

রাসূল (স.) পরকালে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে বলবেন, হে প্রভু আমার জাতি এ কুরআন ছেড়ে দিয়েছিল। (আল ফুরকানঃ৩০)

আল-কুরআনের পথ ভারসাম্যপূর্ণ ঃ

কুরআনের দেখানো পথ ভারসাম্যপূর্ণ। কুরআন মানুষের দেহ এবং আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করেছে। দেহ-মনের চাহিদার প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। আবেগ ও বিবেকের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করেছে। উভয়কে সমানভাবে মূল্যায়ন করেছে।

আল্লাহ বলেন,

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً)

"হে আল্লাহ আমাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে কল্যাণ দান করুন।". (সূরা বাক্বারা : ২০১)

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও তার দায়িত্ববোধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছে। ব্যক্তি স্বার্থ ও সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। এভাবে সবদিক বিবেচনা করে একটি মধ্যবর্তী, উত্তম আদর্শ উপহার দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)

"এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যবর্তী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা মানুষের জন্য সত্যের সাক্ষী হতে পার এবং স্বয়ং রাসূলও (স.) তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন।" (সূরা বাক্বারা : ১৪৩)

এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আহলে কিতাবকে দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ)

"আপনি বলে দিন, হে কিতাবীগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে অনর্থক বাড়াবাড়ি করো না।" (সূরা মায়েদা : ৭৭)

ইসলাম মধ্যবর্তী উম্মতের জন্য আল্লাহর ভারসাম্যপূর্ণ পথ, মধ্যম পন্থা। স্বয়ং রাসূলে (স.) এই মধ্য পন্থার হিফাজাতে সচেষ্ট থাকতেন। কোনভাবে রাসূল (স.) যদি দেখতেন কোন সাহাবী ইসলামের মধ্যপন্থার ব্যতিক্রম করে ফেলেছে, সাথে সাথে তিনি নিজ দায়িত্বে তাদের শুধরিয়ে দিতেন এবং

সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতেন। রাসূল (স.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসে শরিফে বলেন,

إياكم و الغلو في الدين, فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. (إبن ماجه ، نسائي، أحمد)

"তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে সতর্ক থেকো। কারণ, তোমাদের পূর্ববতী জাতিগুলি ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণেই ধ্বংস হয়েছে।" (ইবনে মাজাহ্, নাসায়ী, আহমদ)

ইবনে মাসূদ বর্ণিত (হাদীসে রাসূল (স.) বলেন:

هلك المتعنتون " قالها ثلاثا (رواه مسلم)

"বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়েছে। তিনি একথা তিনবার বলেন।" (মুসলিম শরীফ)

রাসূল (স.) ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করাকে (غلو في الدين) কঠোর ভাষায় প্রতিহত করেছেন। যখনি কোন সাহাবীকে বাড়াবাড়ির পথে এগুতে দেখেছেন, সাথে সাথে সতর্ক করেছেন।

তিনি যখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরকে সিয়াম, কিয়াম ও তিলাওয়াতে কুরআনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে শুনেছেন, তখনই তিনি সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে বলেছেন,

إن لبدنك عليك حقا ، و لعينيك عليك حقا ، و لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا . يعني أعط كل ذي حق حقه .

"নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার শরীরের অধিকার রয়েছে। তোমার উপর তোমার চোখের অধিকার রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে এবং তোমার উপর তোমার সাক্ষাতকারীর অধিকার রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার আদায় করে দাও।" (বুখারী)

এক্ষেত্রে আমরা রাসূলের (স.) তিনজন সাহাবায়ে কিরামের কথা স্মরণ করতে পারি, যারা রাসূল (স.) এর দৈনন্দিন ইবাদতের ব্যাপারে জানতে পেরে যেন পরিতুষ্ট হতে পারেননি। তাঁদের নিজেদের ইবাদতের তৃপ্তি মিটানোর জন্য একজন আজীবন সিয়াম সাধনার প্রতিজ্ঞা করলেন, দ্বিতীয় জন সারারাত কিয়ামে লাইল (রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত) করার প্রতিজ্ঞা

করলেন তৃতীয় জন চির কুমার থাকার প্রতিজ্ঞা করলেন। শুনে প্রিয় রাসূল (স.) নিম্নে দেয়া স্মরণীয় উক্তিটি করলেন,

"أماأني أخشاكم لله و أتقاكم له ، و لكني أصوم و أفطر ، و أقوم و أرقد، و أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ." (رواه البخاري عن أنس)

"আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু ও মুত্তাকী নই কি? তবে আমি সিয়াম সাধনাও করি, আবার বিরতিও দেই। রাত্রে কিয়ামে লাইলও করি আবার মাঝে মাঝে ছেড়েও দেই এবং জীবন সঙ্গিনীও গ্রহণ করেছি। এটাই আমার আদর্শ; যে আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সে আমার উম্মত নয়।" (বুখারী)

আল-কুরআন সহজ সরল পথের সন্ধান দেয় :

আল-কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা সহজ করে নাযিল করেছেন। আল-কুরআন সহজ, আল কোরআনের প্রদর্শিত পথ সহজ, সরল-সোজা পথ ও সীরাতে মুস্তাকীম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)

"আমি কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ সরল করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি?" (সূরা আল ক্বামার:১৮)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে নাযিল করেছেন মানবরচিত মতবাদের বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। দীর্ঘদিনের গোলামীর জিঞ্জির সরিয়ে দিয়ে মুক্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণের জন্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

(فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)

"আমি আপনার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা স্মরণ রাখে।" (সূরা আদ-দুখান : ৫৮)

আল্লাহ্ বলেন,

(يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)

"তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎ কর্মের, বারণ করেন অসৎ কাজ থেকে। তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দিয়েছেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল।"

(আল-আরাফ : ১৫৭)

কুরআনের বিধান সহজ, সরল, উদার ও মহানুভবতায় পরিপূর্ণ। ইসলামে এমন কোন বিধান নেই যা মানুষের কষ্টের কারণ হতে পারে দুনিয়া বা আখেরাতে। আল্লাহর বিধান সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও কল্যাণমুখী। কারণ মহান আল্লাহ শেষ নবীকে পাঠিয়েছেন বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ।

আল্লাহ বলেন,

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)

“আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি।”
(আল-আম্বিয়া : ১০৭)

স্বয়ং রাসূল (সা.) নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

"إنما أنا بعثت معلما ميسرا "(رواه مسلم في كتاب الطلاق)

“নিশ্চয় আমি একজন সহজকারী শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।” (মুসলিম শরীফ)

إنما أنا بعثت رحمة مهداة " (رواه ابن سعد و الحكيم الترمذي و صححه الألباني)

“আমি রহমত ও হিদায়াত ছাড়া আর কিছু নই।” (ইবনে সা’আদ)

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন,

" إن الله لم يبعثني معنتا و لامتعنتا ، ولكن بعثني معلما ميسرا "(رواه مسلم في كتاب الطلاق)

“আল্লাহ্ তা’আলা আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য, বাড়াবাড়ি করার জন্য প্রেরণ করেননি, বরং আমাকে পাঠিয়েছেন একজন সহজকারী শিক্ষক হিসেবে।” (মুসলিম শরীফ)

রাসূল (সা.) আবু মূসা এবং মা’আজ নামক দু’জন সাহাবীকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য সুদূর ইয়েমেনে পাঠানোর প্রাক্কালে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

"يسرا و لاتعسرا، بشرا و لاتنفرا، وتطاوعا و لاتختلفا "
(متفق عليه من أنس)

“সহজ করিও, কঠিন করিও না। সুসংবাদ শুনাবে, নিরুৎসাহিত করিও না। পরস্পর আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিও।” (বুখারী, মুসলিম)

রাসূল (স.) তাঁর কাছে আগত রিসালতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন

"إنني بعثت بحنيفية سمحة". (رواه الطبراني عن ابي أمامة)

“নিশ্চয়ই আমি মধ্যম পন্থা ও উদারনীতি নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।” (তাবরী)

আল-কুরআন সার্বজনীন

আল-কুরআন গোটা মানব জাতির জন্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। স্থান-কাল নির্বিশেষে তাবত মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য শেষ নবী মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি সর্বশেষ ঐশী কিতাব হিসেবে আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً)

"হে নবী! আপনি বলে দিন, হে মানব সকল, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।" (সূরা আরাফ : ১৫৮)

এবং তিনি বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত।

আল্লাহ বলেন,

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)

"হে নবী আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহম স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৭)

তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণের সুংবাদদাতা এবং সকল ধরনের অকল্যাণ থেকে সতর্ককারী।

আল্লাহ বলেন,

(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً)

"বরকতময় আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দার উপর কুরআন নাযিল করেছেন বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হিসাবে।" (সূরা আল-ফুরক্বান : ১)

আল্লাহ আরো বলেন,

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)

"হে নবী আমি আপনাকে গোটা মানব জাতির জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝেনা।" (সূরা সাবা : ২৮)

আল-কুরআনের দাওয়াত মানব জাতির সীমারেখা পেরিয়ে জ্বিন জাতিকেও কল্যাণের পথে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে আহবান করেছে। আল্লাহ বলেন,

(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ...)

"যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কুরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সর্তককারীরূপে ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন কিতাব শুনেছি, যা মূসার উপর অর্বতীণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে। সত্য ধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।" (সূরা আল-আহক্বাফ : ২৯-৩১)

আল-কুরআন সার্বজনীন, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার প্রজ্ঞার্পূণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যা মানবশিশুর জন্ম থেকে মৃত্য পর্যন্ত বরং মানব ভ্রূণের সময়কাল থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত সকল সমস্যার যৌক্তিক, সুন্দর সমাধান কুরআন দিয়েছে। আল-কুরআন এই ব্যাপারে হিদায়াত, দিকনির্দের্শনা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বাড়ীতে, বাজারে, মসজিদে, রাস্তায়, কর্মক্ষেত্রে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, নিজের আত্মার সাথে সম্পর্ক, অন্যের সাথে সম্পর্ক (মুসলমান ও অমুসলিম) বরং মানুষের সাথে সম্পর্ক জীব ও জড় পদার্থের সাথে সম্পর্ক। কার সাথে কি ধরনের আচরণ করা উচিত সব কিছুর সুনিপূণভাবে সমাধান দিয়েছে। কুরআনের এই হিদায়াত মানব শরীর, আত্মা, বিবেক-বুদ্ধি, দৃশ্য-অদৃশ্য, কথা-কাজ, ইচ্ছা-ইবাদাত সব কিছু শামিল করে। কুরআনের দেওয়া এই নীতি-রূল ভারসাম্যপূর্ণ।

আল-কুরআন শুধু আধ্যাত্মিক পবিত্রতা, শিষ্টাচার, নিয়ম শৃংখলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং কুরআন হচ্ছে একটি সর্বাত্মক ও সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুসম অর্থ ব্যবস্থা, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক আইন কানুন এবং জীবনের ছোট বড় সব কিছুই তার মৌল আকীদা বিশ্বাস থেকেই উৎসারিত। কুরআন এক অপরাজেয় দুর্বার শক্তি, পাতায়-পল্লবে, ফলে ফুলে সুশোভিত এক জীবন পদ্ধতি। আল-কুরআন মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে সুসামাঞ্জস্যপূর্ণ, সুপরিকল্পিত ও সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা দান করেছে, তাও কুরআনের ঐশী গ্রন্থ হওয়ার একটি প্রমাণ। কুরআনের এসব চমৎকার কল্যাণকর ও সুন্দর

বিধানাবলীর প্রসংশা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পন্ডিত স্যার ডায়ন্ডবার্স লিখেছেন,

“কুরআনের বিধানাবলী শাহানশাহ থেকে আরম্ভ করে জীর্ণ কুটিরের আধিবাসী পর্যন্ত সকলের জন্য সমান উপযোগী ও কল্যাণকর। দুনিয়ার অন্য কোন ব্যবস্থায় এর বিকল্প খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।”

ডক্টর অসওয়েল জনসন বলেন,

“কুরআনের প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানাবলী এতই কার্যকরী এবং উপযোগী যে, সর্ব যুগের দাবিই এই কুরআন পূরণ করতে সক্ষম। কর্ম কোলাহলপূর্ণ নগরী, মুখর জনপদ, শূন্য মরুভূমি এবং দেশ হতে দেশান্তর পর্যন্ত সব জায়গায় এই বাণী ধ্বনিত হতে দেখা যায়।” (মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কি ও কেন?)

কুরআনে বিবাহ-তালাক সম্পর্কীয় যাবতীয় বিধান রয়েছে। রয়েছে উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় ব্যবস্থাবলী, রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক মূলনীতিসমূহ, যুদ্ধ, সন্ধি সম্পর্কীয় নিয়ম-কানুন।

আল-কুরআনের ঐতিহাসিক দিক ঃ

পবিত্র কুরআনে প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন ঘটনাবলী বিভিন্ন প্রসঙ্গে সংক্ষেপে অথচ এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার সত্যতা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। বরং অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদদের ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের নব নব আবিষ্কার আরো সন্দেহাতিত করে তুলেছে। যেমনঃ আদমের বৃত্তান্ত, নুহের ঘটনা, নমরুদ, ফেরাউন প্রসঙ্গ, আদ, সামুদ, তুব্বা ইত্যাদি জাতিসমূহের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

(تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ)

"এ হলো অজ্ঞাত অজানা ঘটনাবলী, যা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যম অবগত করাচ্ছি। অথচ এসব ঘটনা ইতোপূর্বে না তোমার জানা ছিল, না তোমার জাতির। সুতরাং অপেক্ষা কর, অবশ্যই সফল পরিণতি মুত্তাকী বা খোদাভীরুদের জন্য।" (সূরা হুদ : ৪৯)

আল-কুরআনের আলোকে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা :

কুরআনের ঘোষণার আলোকে ইসলামী প্রশাসক কেবল জনসমষ্টির লাগামের ধারকই হয়না-লাগাম ধরে যেমন ইচ্ছামত অশ্ব ও উট চালানো হয়-প্রশাসক মানুষদের যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে নিয়ে যাবে, নিজ ইচ্ছামত প্রদত্ত আদেশ নিষেধ পালনে মানুষকে বাধ্য করবে, স্বীয় নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিতকরণ ও প্রভুত্বের লালসা চরিতার্থ করবে, তা কখনই হতে পারে না। সেতো হবে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান দায়িত্বশীল, কর্তব্যের বোঝা নিজের মাথায় ধারণকারী।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানবতার জন্য আল্লাহ পাকের রহমত। ইসলামী শাসন চালু হলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এর কল্যাণময়তা সমভাবে উপভোগ করতে পারবে। সকল প্রকার জুলম, শোষণ, নিষ্পেষণ ও নির্যাতন বন্ধ হয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে নিরাপত্তাপূর্ণ, ভীতিহীন শোষণমুক্ত সমাজ।

ইসলামী রাষ্ট্র আদর্শিক চিন্তামূলক রাষ্ট্র। তা প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী আক্বিদা ও বিশ্বাসের ওপর। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্র কোন ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সীমিত নয়। ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে মতাদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। এজন্য কোন জাতি, শ্রেণী, বর্ণ, জাতীয়তা বা আঞ্চলিকতার গুরুত্ব এখানে স্বীকৃত নয়। রাসূল (স.) বলেছেন,

من دعا إلي القومية فليس منا

"গোত্রগত স্বার্থের দিকে যে আহ্বান করে সে আমার দলভুক্ত নয়।" (আবু দাউদ)

ইসলামী রাষ্ট্রের মূল হচ্ছে মুসলমানদের ঐক্য ও পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠন করা। যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ন্যায্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে থাকবে না হত্যা, ধর্ষণ, রাহাজানী, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, সুদ-ঘুষ, মুনাফাখোরী, মজুতদারি ও কালোবাজারির মত জঘন্য সামাজিক অপরাধগুলো।

ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন প্রকৃত মুসলমান, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন বয়োপ্রাপ্ত লোক।

আল্লাহ বলেন,

(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)

আল্লাহ তা'আলা শাসন কার্যের জন্য তোমাদের উপর তাঁকে (তালুত) মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে জ্ঞান-বুদ্ধি এবং দৈহিক শক্তি দান করেছেন। (সূরা আল-বাক্বারা : ২৪৭)

প্রভুত্ব কার হবে এ ব্যাপারে আল্লাহর নীতির সার কথা হলো :

(أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ)

"সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এর উপর প্রভুত্ব চালাবার, একে শাসন করার অধিকারই একমাত্র তাঁরই।" (সূরা আরাফ : ৫৪)

আল্লাহ বলেন,

(إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)

"আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম দেবার অধিকার নেই।" (সূরা ইউছুফ : ৫)

পরামর্শভিত্তিক শাসন :

ব্যক্তির ইচ্ছায় দেশ চলবে না। পরামর্শের ভিত্তিতে শাসন কার্য পরিচালনা করতে হবে। ইসলামী বিধান একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা করে এবং এর পরিবর্তে শূরা (পরামর্শ) ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার উপস্থাপন করেছে।

আল্লাহ বলেন,

(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)

"তাদের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাপার তাদের পরস্পরের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।" (সূরা আশ-শূরা : ৩৮)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)

"এবং তাদের সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ কর।" (আলে-ইমরান : ১৫৯)

ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ ও উদ্দেশ্য ঃ

মহান আল্লাহ তাঁর কালামে এরশাদ করেন :

(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ المُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ)

"আমরা যাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তা ও প্রশাসক বানাই, তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে বন্টনের ব্যবস্থা করে, কেবলমাত্র ভালো ও কল্যাণ কাজের আদেশ করে ও যাবতীয় অকল্যাণ ও ক্ষতিকর কাজ করতে নিষেধ করে।" (সূরা হজ্ব : ৪১)

এরই উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্টিত হয় মদিনার রাষ্ট্র। যার একটি নির্দিষ্ট লিখিত সংবিধান ছিল। এরই আলোকে চারটি দিক বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হল ।

এক ঃ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা ঃ নামাজের ব্যপারে কুরআনে ৮০ বারের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। যা মুসলমান ও কাফিরদের মাঝে পার্থক্য সূচিত করে। আল্লাহ বলেন,

(وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ)

"তোমরা নামায কায়েম কর।" (সূরা বাক্বরা: ১১০)

দুই ঃ যাকাত আদায় ও বন্টন করা ঃ যাকাত কার থেকে আদায় করবে এবং কাদের মাঝে বন্টন করবে তারও সুনির্দিষ্ট খাত বর্নণা করা হয়েছে। যেমন,

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

"হে নবী আপনি তাদের ধন সম্পদ হতে যাকাত সাদাকাত গ্রহণ করুন, এর মাধ্যমে তাদেরকে আপনি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন"। (সূরা তাওবা : ১০৩)

তিন ঃ সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান ঃ সৎ ও সকল কল্যাণমূলক কাজের দায়-দায়িত্বের মাঝে সরকারের ঘাড়ে এক ভাগ বর্তাবে আর তাই হলো সিংহভাগ যা একার পক্ষে সম্ভব না। এতে প্রজাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

যেমন,

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان)

তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কল্যাণকর কাজে (রাজা- প্রজা) একে অপরকে সহয়তা কর। (সূরা আল মায়ীদা ঃ ২)

চার ঃ অকল্যাণ কাজ থেকে বাধা প্রদানঃ মন্দ কাজ থেকে সরকার বাধা না দিলে এর দায়ভার সরকারের কাঁধে বর্তাবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বস্তরের জনতা নিজ নিজ অবস্থান থেকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ঈমানী দায়িত্ব পালন করে যাবে।

রাসূল (সা.) বলেন,

من رأي منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذالك أضعف الإيمان.

"তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অকল্যাণ ও অশ্লীল কিছু ঘটতে দেখ প্রথমে শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দেবে (যদি স্বামর্থ থাকে)। যদি তা সম্ভব না হয়, সুন্দর ভাষা দিয়ে বিরত রাখতে চেষ্টা করবে, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত মনে-প্রাণে ঘৃণা করবে এবং তা সর্বপেক্ষা দূর্বল ঈমান।" (মুসলিম শরীফ)

আল-কুরআনের আলোকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ

মানব জীবনে সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনীতির ভাষায় অভাব অফুরন্ত, তাই মানুষের চাহিদার শেষ থাকে না, মানুষ দুনিয়ার সম্পদের ব্যাপারে স্বভাবজাত লোভী। কোনভাবেই সে তৃপ্ত হতে চায় না। মহানবী (স.) মানুষের এ লোভের কথা এভাবে চিত্রায়িত করেছেন,

لوكان لإبن أدم واديين من ذهب يبتغي ثالثا، ولايملأ عين ابن آدم إلا التراب.

"আদম সন্তানের কাছে যদি স্বর্ণের দুটি উপত্যকা থাকে তাহলে সে তৃতীয় আরেকটি পেতে চায়। আদম সন্তানের চক্ষু মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা যাবে না।" (বোখারী)

মুমিন ব্যক্তি বিশ্বাস করে, প্রকৃত ধনী অঢেল সম্পত্তি ও প্রচুর বিত্তের মাধ্যমে হওয়া যায় না। এর মূল সম্পর্ক হল মনের সাথে। হাদীসে তাই বলা হয়েছে,

ليس الغني بكثرة العرض، إنما الغني غني النفس.

"অধিক সম্পদ সংগ্রহ স্বচ্ছলতা নয়, মনের প্রাচুর্যই আসল স্বচ্ছলতা।" (বোখারী, মুসলিম)

অতিরিক্ত জীবনোপকরণ সংগ্রহের নাম সুখ নয়, সুখের সম্পর্ক মনের সাথে। তাদের সান্ত্বনার জন্য রাসূল (স.) বলেছেন,

আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বরাদ্দ করেছেন তা মেনে নাও, তাহলে তুমি হবে সেরা স্বচ্ছল ব্যক্তি। (ইবনে মাজা)

তাই বলে ইসলাম সম্পদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেনি, বরং হালাল রুজির জন্য পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করেছে। বরং তা ওয়াজিব করে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

(فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)

"নামাজ পড়া শেষ করার পর তোমরা জমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ, ধন-সম্পদ রিযিক অনুসন্ধান কর।" (সূরা আল-জুম'আ : ১০)

আল্লাহ আরো বলেন,

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

"সেই আল্লাহই যিনি তোমাদের জন্য জমীনকে উর্বর ও চাষযোগ্য বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তাঁর কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর।" (সূরা আল-মুলক : ১৫)

তাই ইসলাম সম্পদের ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করেছে এবং মানুষের মন যখন সুস্থ হয়ে যাবে সম্পদ তখন তার হাতে কল্যাণের উপকরণ হিসেবে প্রমাণিত হবে। তাই রাসূল (স.) বলেন,

نعم المال الصالح للرجل الصالح

"সৎ মানুষের সৎ সম্পদ কতই উৎকৃষ্ট।"

তবে এ ব্যাপারটি আবেগপূর্ণও বটে। কেননা মানব জীবনের চাকা তারই উপর আবর্তিত হয়। ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, সেহেতু মানুষের জন্য অর্থনৈতিক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে গঠন করার জন্য এক নির্ভুল ও সমৃদ্ধ অর্থ ব্যবস্থা পেশ করেছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً)

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পার। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থার প্রতি বড় করুণাশীল। যারা জুলুম সহকারে এভাবে সীমা অতিক্রম করে আমি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করব।" (সূরা নিসা : ৩০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন,

(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পদ্ধতিতে খেয়ো না এবং শাসকদের সামনে এগুলোকে এমন কোন উদ্দেশ্যে পেশ করো না যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা অন্যের সম্পদ এর কিছু অংশ খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাও।" (সূরা আল বাক্বারা : ১৮৮)

অত্র আয়াতটির অর্থ হলো, শাসকদেরকে উৎকোচ দিয়ে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করো না। যখন তোমরা জানো এগুলো অন্যের সম্পদ কিন্তু মালিকের কাছে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় আদালতের ধারায় নিয়ে গিয়ে তার সম্পদ গ্রাস করার চেষ্টা করো না। আর আদালত থেকে বৈধ মালিকানা লাভ করার পরও তুমি এর বৈধ মালিক হতে পারবে না। আল্লাহর কাছে তোমার জন্য তা হারামই থাকবে।

হাদিসে নবী করিম (স.) বলেছেন,

"আমিতো একজন মানুষ। হতে পারে তোমরা একটি মামলা আমার কাছে আনলে, এক্ষেত্রে দেখা গেল তোমাদের একপক্ষ অন্যপক্ষের তুলনায় বেশী বাকপটু এবং তাদের যুক্তি আলোচনা শুনে আমি তাদের পক্ষে রায় দিতে পারি। কিন্তু জেনে রেখো তোমার ভাইয়ের অধিকারভুক্ত কোন জিনিস যদি তুমি এভাবে আমার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লাভ কর, তা হলে তুমি একটা দোযখের টুকরা লাভ করলে।"

আল কুরআনের আলোকে রাজনীতি ঃ

ইসলামী রাজনীতির প্রধান ও প্রথম উৎস হল আল-কুরআন। ইসলাম হলো আকায়েদ, ইবাদাত, মো'আমেলাত ও আখলাক্বের সমন্বয়ে গঠিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত তাসবীহ তাহলীল, দান-সাদকাজাতীয় ইবাদতের পাশাপাশি যেখানে রাজনীতি সমাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি তথা মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যৌক্তিক সুন্দর সমাধান রয়েছে। ইসলামের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমে আলোচনা করতে হবে সার্বভৌম প্রভূত্ব (Sovereignty) কার? কাকে আমরা প্রভূশক্তি বলে স্বীকার করব? ইসলামী রাজনীতিতে এই সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য। তাঁর উচ্চতর প্রভূত্ব, একচ্ছত্র মালিকানা এবং নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতা এই উভয় দিক দিয়ে অখন্ড অবিভাজ্য অংশহীন।

কোন পথের রাজনীতি করা যাবে ঃ

যে রাজনীতি মানবতা শিক্ষা দেয়, যে নীতির আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হলে মানবতার ক্ষতি সাধিত হয় না, সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশে ইনসাফ কায়েম হয়, সে রাজনীতি করাই বিশ্বমানবের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
আল্লাহর কালামের বাণী হলো,

(إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً)

"নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি পূর্ণ কিতাব এজন্য নাজিল করেছি যে, তুমি সে অনুযায়ী মানুষের উপর আল্লাহর প্রদর্শিত পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালানা করবে এবং বিচার কার্যে ইনসাফ কায়েম করবে। তুমি এসকল খেয়ানতকারীদের সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী হয়ো না।" (সূরা নিসা : ১০৫)
এব্যপারে আল্লাহর নীতি-যেহেতু এ সৃষ্টির স্রষ্টা এক সবাই তা স্বীকার করে। সেহেতু স্রষ্টার আইনেই পরিচালিত হবে। যেমন পরিচালিত হয় আকাশ জমিন, গ্রহ-তারা,গাছপালাসহ সকল প্রাণী। কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষের মাঝে অনেকে তাঁর আইন না মেনে তাদের খেয়াল-খুশি মত মানবরচিত আইনের অনুসরণ করে।
তাদের জন্য আল্লাহর বাণী,

(يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ)

"তারা বলে (শাসনতন্ত্রে) আমাদের এখতিয়ারের কিছু আছে কি? বল এখতিয়ার সবটুকু আল্লাহর।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৪)

আল-কুরআনের আলোকে শিষ্টাচার ও সৌজন্য ঃ

অন্যের ঘরে প্রবেশের নিয়ম ঃ আজকের একবিংশ শতাব্দীর এই সভ্যতার যুগে কারো ঘরে প্রবেশের সময় বাহিরে থেকে কলিংবেল টিপে প্রবেশের অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু মহা আল্লাহ চৌদ্দশত বছর পূর্বে কুরানের মাধ্যেমে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

"হে ইমানদার ব্যক্তিরা! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে, ঘরের লোকদের অনুমতি না নিয়ে, তাদের প্রতি সালাম না করে কখনো প্রবেশ করো না। আর এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে করে তোমরা মনে রাখতে পারো।" (সূরা নূর : ২৭)

ঘরের লোকজন তাদের প্রয়োজনে ঘরোয়া পোশাকেও অবস্থান করতে পারে। এজন্য সম্বোধন করেই প্রবেশ করতে হয়। আর এটি সভ্যতা-শালীনতা ও নৈতিকতার উত্তম পর্যায়।

দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিগত কক্ষে প্রবেশে অনুমতি প্রসংগে ঃ

আল্লাহর নবীদের চেয়ে বড় দায়িত্বশীল আর কেউ নেই। তাঁদের কক্ষে প্রবেশ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

(لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ)

"হে ইমানদারগণ! তোমরা নবীর ঘরগুলোতে প্রবেশ করো না। অবশ্য যখন তোমাদের খাবারে আসার অনুমতি দেয়া হয়, যাতে তোমাদের খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে না হয় কিন্তু কখোনো যদি তোমাদের ডাকা হয় তবে যেতে পারবে। আর যখন খাবার শেষ হয় তখন সাথে সাথে ফিরে যাবে। অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত হবে না। তোমাদের এসব বিষয় নবীকে কষ্ট দেয়। কেননা তিনি তোমাদের তা বলতে সংকোচ বোধ করেন, অথচ আল্লাহ সত্য বলতে মোটেই সংকোচ বোধ করেন না।"

(সূরা আল আহযাব : ৫৩)

একজন সমাজ বিজ্ঞানী বলেন, "দেড়হাজার বছর পূর্বে মুহাম্মদের ঈশ্বর তাঁকে এমন শিষ্টাচারের বাণী নিয়ে পাঠিয়েছেন যা বিশ্বমানবের চির অনুকরণীয়।" বর্তমানেও অন্যদের আবাসস্থলে যাওয়ার সময় তার অনুমতি অবশ্যই নিতে হয়।

তুচ্ছজ্ঞান না করাঃ একজন মানুষের মান-সম্মান অন্যজনের নিকট আমানত। কেননা আজ যাকে তুচ্ছজ্ঞান করা হচ্ছে হয়তবা স্রষ্টা তাকে একদিন তুচ্ছজ্ঞানকারীর চেয়ে সম্মানিত করে দিতে পারেন। আর অনেক সময় এটা পতনের কারণও হয়। তুচ্ছজ্ঞানকৃত ব্যক্তি হতশায় পড়ে তার জীবনে একদিন অন্ধকার নেমে আসতে পারে।

এ ব্যাপারে আল-কুরআনের বাণী হলো,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ)

"হে ইমানদারগণ তোমাদের কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা এমনও তো হতে পারে যে, যাদের আজ উপহাস করা হচ্ছে তারা (একদিন) উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম।" (সূরা আল হুজরাত:১১)

আল-কুরআন ও বিজ্ঞান চর্চা

রহমানের সৃষ্টিতে আমরা কোথাও কোন অসঙ্গতি দেখতে পাই না। যেদিকে তাকায় সেদিকেই সুন্দর আকর্ষণীয়, মনকে নাড়া দেয়। আমরা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পারি, গবেষণা করতে পারি, এ বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে যা অনেক সহজতর হয়েছে। গবেষণার অনেক উপকরণ, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আবিস্কৃত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাচ্ছে কুরআনের অলৌকিত্ব আরো বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

ইসলাম শান্তি, যুক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যা সৃষ্টি, স্রষ্টা সকলকেই জ্ঞানের অতিসুক্ষ্ম চুলছেড়া হিসাবের মাত্রায় ব্যাখ্যা করতে পারে। ক্রেড় হোয়েলেব বলেন, Various animals are literate in various degrees. A dog has trouble in understanding a power station and man has trable in understanding religion. কুরআনে এমন কাহিনী আছে যা রূপকথাকে হার মানায়, এমন ছবি আছে যা আজ পর্যন্ত কোন শিল্পীই আঁকতে পারেনি, এমন সুরের মুর্ছনা ও ব্যাথার রাগিনী আছে যা সমস্ত সুরের জগতকে আচ্ছন্ন কওে রাখে। এমন বিজ্ঞানের তত্ত্ব আছে যা এখনো অনাবিস্কৃত।

প্রত্যক্ষ দর্শন ও অভিজ্ঞতা ঃ

পদার্থ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান এবং জোতিবিদ্যা নিজস্ব মতামত, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, সাধারণ ধারনা, জ্ঞানীদের চমৎকার বক্তব্যের উপর নির্ভর করে না; বরং তা প্রত্যক্ষ দর্শন ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, যা পঞ্চইন্দ্রিয় বিশেষ করে চোখ এবং কান দ্বারা অর্জন করা যায়। প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য শর্ত হচ্ছে- যন্ত্রের মাধ্যমে সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। যেমন-

(ক) মাইক্রোস্কোপ (Microscope) ঃ যার দ্বারা অতি ছোট জিনিস দেখা যায় যা খালি চোখে দেখা যায় না।

(খ) টেলিস্কোপ (Telescope)ঃ এই যন্ত্র ব্যবহার করে দূর-দূরান্তের নক্ষত্র নীহারিকার অনেক অজ্ঞাত গোপনীয়তা জানা যায়।

প্রত্যক্ষ দর্শন এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে পদার্থ বিদ্যা সঠিক অবস্থানে পৌঁছে গেছে। বর্তমানে পদার্থ বিদ্যা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যেভাবে বিস্তৃতি অর্জন করছে যদি সেভাবে প্রসারিত না হত, তাহলে এখনো পর্যন্ত সৃষ্টির অনেক রহস্য গোপন থেকে যেত।

প্রত্যক্ষ দর্শন যেমন বিজ্ঞানের মূল উৎস, তেমন কুরআনেরও মূল নীতি। আল-কুরআনের অনেক আয়াত শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি ব্যবহার করে জ্ঞান অর্জনের আদেশ এসেছে। যেমন- মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠)

বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন কর এবং দেখ তিনি কিবাবে সৃষ্টি কর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুর্ণবার সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব করতে সক্ষম। (আনকাবুত : ২০)

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে আরো বলেন,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٤٦)

"তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন কর্নের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয়না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।" (সূরা হজ্জা : ৪৬)

এখানে অন্তর দ্বারা বিবেককে বুঝানো হয়েছে। নিশ্চয় মরিচা পড়ে যাওয়া অন্তর কখনো বুঝতে পারে না। কেননা, তার কাছে আলোকিত দৃষ্টি না থাকার কারণে পর্দা পড়ে যায়। যে আলোকিত দৃষ্টির উপর সঠিক জীবন যাপন প্রতিষ্ঠিত। যার দৃষ্টি আছে কিন্তু বুঝতে পারে না, তাকে আল্লাহ চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٧٩)

"তাদের অন্তর আছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তার চোখ আছে, তার দ্বারা দেখে না। আর তাদের কান আছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর।" (সূরা আরাফ : ১৭৯)
জ্ঞান, দেখা শুনা এবং বিবেকের উপর নির্ভরশীল। একজন শিশুকে যদি জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া থেকে বিরত রাখা হয় তবে সে শিশু যৌবনে পদার্পন করলেও জ্ঞানের দিক দিয়ে সে শিশুই থেকে যাযা, আচরণ হয়, শিশু সূলভ, এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।" (সুরা নাহল : ৭৮)

আল-কুরআন যে জ্ঞানের দিকে আহবান করে ঃ জ্ঞান সকল অজ্ঞতাকে দূরভীত করে। তা ধর্মীয় বিষয়ে হোক বা বস্তুগত বিষয়ে হোক, কুরআনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পদার্থ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান এবং পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান।

পদার্থ বিদ্যা (Physics) ঃ পদার্থ বিদ্যা অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করে আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (٢٢)

"তার আরও এক নিদর্শন হচ্ছে- নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (সূরা রুম : ২২)
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٢٧)وَمِنَ

النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٢٨)

"তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষন করেন অতঃপর তদ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফল-মুল উদগত করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ সাদা-লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ। অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির : ২৭, ২৮)

এ আয়াতগুলোর আলোকে বুঝা যাচ্ছে "জ্ঞানী" বলতে উদ্দেশ্য হল যারা ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি সৃষ্টির রহস্যের ব্যাপারে সম্যক ধারণা রাখে। আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য নিয়ে চিন্তা করে।

এই আয়াতগুলো পদার্থ বিদ্যা শিখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য আহবান করেছেন। এই আয়াত দ্বারা পদার্থ বিদ্যাকে বুঝানো হয়েছে।

ফাতিরের আয়াতের মধ্যে বলা হচ্ছে- পদার্থ বিদ্যা ছাড়া আকাশ থেকে পানি বর্ষনের রহস্য সম্পর্কে জানা যাবে না। ক্যামেস্টির জ্ঞান ছাড়া তার গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যাবে না। উদ্ভিদ বিদ্যা ছাড়া উদ্ভিদ এবং ফলমুলের জ্ঞান অর্জন করা যাবে না। ভূতত্ত্ব (Geology) জ্ঞান ছাড়া পাহাড় এবং তার লাল, সাদা, কালো স্তর সম্পর্কে জানা যাবে না; এবং প্রাণী বিদ্যা ছাড়া চতুষ্পদ জন্তু, পোকামাকড় এবং মানুষের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জানা যাবে না। ওলামারা হচ্ছেন, যারা মহাবিশ্ব সম্পর্কিত আল্লাহর আয়াত নিয়ে গভীর গবেষণা করেন। কেননা তারা যখন বিশ্বাসী হয় তখন প্রকৃতির বিভিন্ন গোপন রহস্যের জ্ঞান তাদের মধ্যে আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি করে দেয়।

জীববিজ্ঞান (Biology) ঃ জীব বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার প্রতি উৎসাহিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)

মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে, সবেগে স্থলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে। (সূরা তারেক : ৫-৭)

সৃষ্টির মৌলিকত্ব নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ প্রাণী বিদ্যা আবিস্কার করেছেন এবং তার মধ্যে আশ্চর্য জনক হলো, মানুষের জীবকোষ ও সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর পরিবর্তন ও উন্নতি। আর তাই হচ্ছে জীববিজ্ঞান।

মনো বিজ্ঞান (Psychology) ঃ কুরআন নির্দেশ দিয়েছে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করার জন্য। আর তা স্পষ্ট হয়েছে এই আয়াতের মধ্যে: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (٢٠)وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (٢١)

"বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নির্দেশনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও তোমরা কি অনুধাবন করতে পার?" (সূরা জারিয়াত : ২০-২১)

মানুষ নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা, গবেষণা করা, তাদের নিয়ে পর্যালোচনা করা, মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয় যার প্রতি আল-কুরআন আমাদেরকে উৎসাহিত করছে।

নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের উৎস। তার মধ্যে রয়েছে স্বভাবকে পর্যবেক্ষণ করা, মুখ প্রবণতা এবং মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ।

সমাজ বিজ্ঞান (Socilogy) ঃ বিশ্বে যা কিছু মুসলমানদের সম্মুখে আছে তা নিয়ে গবেষণা করা যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ববর্তী জাতিদের রাষ্ট্রীয় শক্তি, পৃথিবী আবাদ তাদের উত্তান-পতন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হবে এবং তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে। আর তাই হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٩)

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না। অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশী আবাদ করত, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলনা কিন্তু তারা নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করেছিল।" (সূরা রূম : ৯)

নিশ্চয় আল-কুরআন একটি সম্প্রদায়ের নিকট শিক্ষা সফরের শিক্ষা নিয়ে এসেছে, যেন একটি জাতির সৃষ্টি, ধ্বংস, উন্নতি, পতন ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে। আর এই জ্ঞান হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান।

আল-কুরআন ও ভূগোল শাস্ত্র (Geography) ঃ

আল-কুরআনে আল্লাহ তাঁর আসীম কুদরতের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঊর্ধ্বলোক ও ভূমন্ডল এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যেসব তথ্যের অবতারণা করছেন, বিজ্ঞানের উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে তার বাস্তবতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি নমুনা পেশ করা হল :

* মহাশূন্যে যে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ একটি অপরটিকে আকর্ষণ করে এবং এরই ফলে এরা শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, ১৬৬৫ সালে নিউটনের (Law of Gravitaion) আবিষ্কারের পূর্বে জগদ্বাসী এর বিশেষ কোন খবর রাখত না। কিন্তু নিউটনের জন্মের প্রায় হাজার বছর পূর্বে এ তথ্য ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবীকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন,

যে শক্তিবলে ঊর্ধ্বলোকের যাবতীয় বস্তু এবং ভূমন্ডল শূন্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আলোচ্য আয়াতে 'আমরুল্লাহ' বলে তাকে বুঝানো হয়েছে। আর সেটাই হচ্ছে নিউটনের আবিস্কৃত মধ্যাকর্ষণ শক্তি।

* সৃষ্টির ব্যাপারে বিশ্বের সর্বত্রই যে আল্লাহ তা'আলা দ্বৈত বা জোড়া পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, ফরাসী পদার্থ বিজ্ঞানী দ্রফ ব্রগলী ১৯১৫ সালে এই আশ্চর্য দ্বৈতরূপের প্রথম ইঙ্গিত করেন। তার মতে, প্রকৃতির সর্বত্রই যে দ্বৈতভাব বিরাজ করছে আলোর দ্বৈতধর্ম তারই একটি দিক মাত্র। অথচ দ্রফ ব্রগলির প্রায় তেরশত বছর পূর্বে এই দ্বৈতভাবের কথা মানুষকে কুরানের মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন,
(سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ)

"পবিত্র তিনি, যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, মানুষকে এবং যা তারা জানে না তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা ইয়াসীন : ৩৫)
এরই মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ একটিকে অন্যটির বিপরীতে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন।
* চন্দ্র সূর্যসহ বিশ্বের সবকিছুই যে অবিরতভাবে গতিশীল কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের জন্মের বহু পূর্বে কথাগুলো ঘোষণা দিয়ে কুরআন বলেছে,
(وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ- وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ)

"সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশীল, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করে দিয়েছি। সর্বশেষ যে পুরাতন খেজুর শাখায় অনুরূপ হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসীন : ৩৮)
নিজের আত্মার সাথে সম্পর্ক, অন্যের সাথে সম্পর্ক (মুসলমান অমুসলমান) বরং মানুষের সাথে সম্পর্ক, জীব-জন্তু ও জড়পদার্থের সাথে সম্পর্ক, কার সাথে কি ধরনের আচরণ করা উচিত সব কিছুর সুনিপুণ সমাধান দিয়েছে। কুরআনের এই হিদায়ত মানব শরীর, আত্মা, বিবেক-বুদ্ধি, দৃশ্য-অদৃশ্য কথা কাজ সবকিছুকে শামিল করে।
* সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় নক্ষত্র নীহারিকা ও সৌরজগৎ যে পরস্পর সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন ছিল, বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বে কোরআন আমাদেরকে তার সন্ধান দিয়েছে।
আল্লাহ বলেন,
(أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ)

"কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরস্পর সংযুক্ত ছিল। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম।" (সূরা আল আম্বিয়া:৩৩)

* বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বেলজিয়ামের বিশ্বতত্ত্ববিদ আথেল্যে মেতরের কথা হলো এই যে, একটি বিরাটকায় আদিম অনু হতেই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। অনুটি কালক্রমে বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং তার নানা অংশ নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

* জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ গ্যামো বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে নিম্নের ব্যাখ্যাটি প্রদান করেন :

আদিতে বিশ্বের কেন্দ্র সমজাতীয় আদিম বাষ্পের একটা জ্বলন্ত নরক কুন্ড ছিল। ক্রমে ক্রমে এই মহাজাগতিক ভর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে এবং বিভিন্ন অংশের তাপমাত্রা ক্রমেই কমতে থাকে।

উপরোক্ত দু'জন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর মতের সাথে কুরআনের ঘোষণাটির আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনযোগ দিলেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ। অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা স্বেচ্ছায় এলাম।" (সূরা হা-মীম সেজদা : ১১)

* মহাবিশ্বের সৌরজগতসহ বিভিন্ন জগতের সময়কাল ও দিবারাত্রির পরিমাণ যে এক নয়, বর্তমান বিজ্ঞানের অনেক আগে কুরআন তা ইঙ্গিত করেছে। যেমন,

(يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ)

"তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতপর তা তাঁর কাছে পৌঁছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছর সমান।" (সূরা সিজদাহ্ : ৫)

কুরআন অবতীর্ণ হবার সময় কালের এ ব্যবধানটি বোধগম্য না হলেও বর্তমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের কাছে সহজ ও বোধগম্য করে দিয়েছে। এ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের উক্তি হলো, প্রত্যেক জগতের একটি নিজস্ব কাল আছে। জগতের উল্লেখ না করে কোন ঘটনার কালের উল্লেখের কোন অর্থই হয় না। প্রত্যেক জগতের গতিবেগ অনুসারে স্থান ও কালের পরিবর্তন ঘটে ।

* পবিত্র কুরানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

(وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا . وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا . مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ)

"অতঃপর তিনি জমিনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন, তা হতে পানি ও তরুলতাদি নির্গত করেছেন এবং তিনি পাহাড়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করছেন। আর তা হলো (গাছ-গাছালি) তোমাদের এবং তোমাদের জন্তু-জানোয়ারদের জন্য মূল্যবান সম্পদ।" (সূরা নাযি'আত : ৩০-৩৪)

বর্তমান বিজ্ঞানীগণ উদ্ভিদ সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রকৃতির মধ্যে মানুষের এবং জন্তু-জানোয়ারের জন্য উদ্ভিদের চেয়ে পরম বন্ধু আর কেউ নেই। কেননা উদ্ভিদ শুধু আমাদের খাদ্যই জোগায় না, বায়ু হতে বিষাক্ত গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইড চুষে নিয়ে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস এর জন্য অক্সিজেন তৈরি করে দেয়।

ইসলামী সভ্যতায় পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি ঃ

পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা স্বীকৃতি দিয়েছেন, প্রথম যুগের মুসলমানগণ বিশ্বের সমস্ত জাতির নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন জ্ঞান এবং শিল্প থেকে যা পেয়েছেন তা তারা গ্রহণ করেছেন এবং গভীর সাধনা করে তাকে নিপুন করেছেন। যেসব লিখিত পাণ্ডুলিপি ভিন্ন ভাষায় হওয়ার কারণে তারা বুঝতে পারত না, তা তারা সেই ভাষার বিশেষজ্ঞদের অনুবাদ করার জন্য বেশি পারিশ্রমিক দিয়ে নিয়োজিত করত এবং গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করত। মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমস্ত জাতির জন্য পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং তার দ্বারা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

"জ্ঞান এবং ধর্মের দ্বন্দ" নামক বইয়ের লেখক দারিবার বলেন- "মুহাম্মদ (সা.) এর ওফাতের মাত্র ছয় বছর পর অর্থাৎ মুসলমানদের প্রাথমিক যুগে তারা জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। দুই শতাব্দীর ব্যবধানে তারা গ্রীকদের সমস্ত জ্ঞানের কিতাব আয়ত্ত্বে করে নেয়। অতঃপর বাগদাদ বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়।"

তিনি আরো বলেন- মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইউরোপীয় ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ইউরোপীয়ানরা জ্ঞানার্জনের জন্য মুসলিম বিশ্বের দিকে ভিড় জমাত।

"আরবের ইতিহাস" বইয়ের লেখক Sedillot বলেন- "মধ্যযুগে মুসলমানরা জ্ঞান, দর্শন এবং শিল্পের ক্ষেত্রে অনন্য ছিল।"

"প্রাচ্যে আরবের প্রভাব শুধুমাত্র দ্বীন, ভাষা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ছিল না; বরং সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভাব ছিল সুগভীর।"

"পাশ্চাত্যে আরবরা মহান প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। ইউরোপ সভ্যতা আরবের কাছে আজ গভীরভাবে ঋণী। পাশ্চাত্য সভ্যতায় আরব মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে জানতে হলে আরব সভ্যতা যখন পাশ্চাত্যে প্রবেশ করেছিল তখন ইউরোপের কি অবস্থা ছিল তা জানতে হবে। আমরা যদি নবম শতাব্দীর দিকে ফিরে যায় তখন দেখতে পায় আন্দোলুসে আরব সভ্যতা যখন উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে তখন ইউরোপের সংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে ছিল কিছু টাওয়ার সেখানে বসবাস করত জমিদার এবং বর্বর শ্রেণীর একদল লোক। তারা এই অজ্ঞতা এবং বর্বরতার মধ্যে

একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অবস্থান করে। অতঃপর একদল যুবক যারা অজ্ঞতার কফিন ছুড়ে ফেলার অঙ্গীকার করে তখন তারা আরবদের দিকে মুখ ফিরাল।"

প্রফেসর লিবরী বলেন- "যদি আরবরা সেই জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম শিখরে আরোহন না করত তবে ইউরোপের বর্তমান জ্ঞানের যে রেঁনেসা তা কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যেত"।

"সুদীর্ঘ ছয় শতাব্দী ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরবের বিজ্ঞান সম্পর্কিত বইয়ের অনুবাদই ছিল তাদের একমাত্র উৎস ও রেফারেন্স বুক"।

কুরআন এই দুনিয়া জোড়া চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে গোটা মানব জাতির বিগত দেড় হাজার বৎসরের নীরবতাই সবচাইতে বড় প্রমাণ যে- "আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। তা এক মহা সাফল্য।" সময় অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করবে, বিজ্ঞান বাস্তবিকই কুরআনের জ্ঞান থেকে হাজার হাজার বছর পিছিয়ে। বিজ্ঞানের নব আবিস্কার তা কখনো কুরআন থেকে নেয়া হচ্ছে, আবার কখনো আবিস্কৃত জিনিস কুরআন দেড় হাজার বছর আগে বলে দিয়েছে। সত্যকে শত্রুও স্বীকার করতে বাধ্য এবং কোন দলীল তখনই বেশি অকাট্য হয় যখন শত্রু স্বীকৃতি দেয়। আমরা আজ ইসলাম, মুসলিম এবং বিজ্ঞানময় কুরআন সম্পর্কে অমুসলিমদের অকপটে স্বীকৃতি পাচ্ছি। কিন্তু তা এখন সোনালী অতীত ছাড়া কিছু নয়। বর্তমান মুসলিমরা স্রোতের প্রবাহে গা এলিয়ে দিয়েছে।

লেখক পরিচিত

মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল কক্সবাজার সদরের চৌফলদন্ডী ইউনিয়নের হাকিমীয়া পাড়ায় (পশ্চিম কোনাপাড়া) এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৭৫ সনের ২২ ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট সমাজসেবক শিক্ষাগুরু আলহাজ্ব আবদুল হাকিম মাষ্টার ও কুলসুমা খাতুনের কনিষ্ট পুত্র। ১৯৯৩ সনে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া দারুল মা'আরিফ হতে তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস) শ্রেণীতে মমতাজ (একসিলেন্ট) সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম লাভ করেন। ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা মুনাওয়ারায় আরবী ভাষা অনুষদের আরবী সাহিত্য বিভাগ হতে স্কলারশিপসহ চার বছরের বি,এ অনার্স (লিসেনসিয়েট) ডিগ্রী প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৯৮ সনে দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা থেকে ইসলামী স্টাডিজ ও দাওয়া অনুষদ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এম,এ সম্পন্ন করেন। ২০০০ সনে সউদী সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কলারশিপ নিয়ে তিনি কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ থেকে পোষ্ট গ্রেজোয়াট ডিগ্রীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দেশের স্বনামধন্য ইসলামী শিক্ষা নিকেতন জামেয়া দারুল মা'আরিফে (১৯৯৩-২০০২-এর বিভিন্ন সময়ে) হাদীস ও আরবী সাহিত্যের সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ২০০২ সনের ১৬ অক্টোবর তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের কুরআনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামী স্টাডিজ বিভাগে যোগদান করেন। দীর্ঘ ছয় বছর যাবত সেখানে তিনি কৃতিত্বের সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, আরবী সাহিত্য বিভাগের অধীনে এমফিল গবেষক।

ভারত থেকে প্রকাশিত আল-বাআসুল ইসলামীসহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনে তাঁর বহু প্রবন্ধ ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

- প্রকাশক

মিছবাহুল ফালাহ প্রকাশনী